নিরীক্ষা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪৭তম সংখ্যা

আইনবিষয়ক সাংবাদিকতা

নিরীক্ষা

২৪৭তম সংখ্যা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

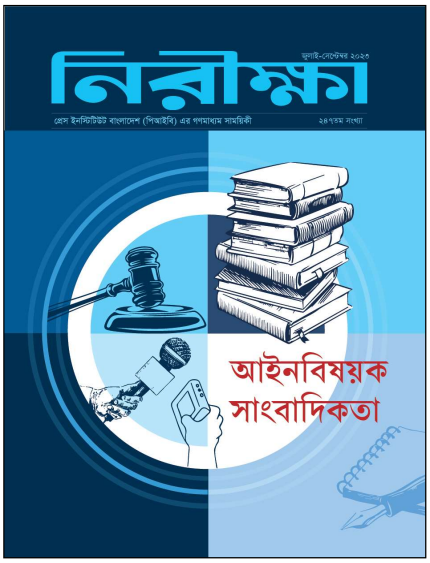

সাংবাদিকতা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং পেশা। নানা প্রেক্ষাপটে এ পেশায় অত্যন্ত ঝুঁকি এবং বৈরী পরিবেশ-পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এগোতে হয়; বিশেষ করে বিটভিত্তিক সাংবাদিকতায়। আদালতবিষয়ক সাংবাদিকতা এর মধ্যে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ। এ বিটের সাংবাদিককে আইনের নানা দিক বিশ্লেষণ করে সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন লিখতে বা সম্প্রচার করতে মানতে হয় বিধিনিষেধ, জানতে ও শিখতে হয় আইনকানুন। খেয়াল রাখতে হয় সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে আদালতের দেওয়া কোনো রায়, আদেশ বা নির্দেশ সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হলো কি না। বিশেষ করে পরিবেশিত সংবাদটি আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ছে কি না।

যে কোনো মামলার শুনানি শেষে যখন পক্ষ-বিপক্ষ মিডিয়ার সামনে কথা বলেন, তখন সাধারণ মানুষের কাছে মনে হবে দুপক্ষই সঠিক। তাই আদালতবিষয়ক সাংবাদিকদের প্রকৃত সত্যটি উদ্‌ঘাটন করতে হয়। তাদের খেয়াল রাখতে হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটি যেন বিচারালয়কে খাটো না করে, বিচারাধীন কোনো মামলার রায় প্রদানের ক্ষেত্রে প্রভাব না ফেলে, কোনো পক্ষ সম্পর্কে যেন বেশি বলা না হয়ে যায় এবং প্রতিবেদনটি বিচারের সঠিক ধারাকে বাধা কিংবা জনমনে যেন বিরূপ ধারণার জন্ম না দেয়–অর্থাৎ মিডিয়া ট্রায়াল যেন না হয়। সেদিক বিবেচনায় পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় উচিত বিচার বিভাগ ও আদালত সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনের আগে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করা। জানা জরুরি আইন কীভাবে কাজ করে এবং প্রতিবেদনগুলো আইন অনুসরণ করছে কি না।

প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ অনুযায়ী সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় কিছু আচরণবিধি আছে, যা একজন সাংবাদিককে মেনে চলতে হয়। জনগণের ওপর প্রভাব ফেলে–এমন বিষয় জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা সাংবাদিকতায় নৈতিকতার অংশ। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা, বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনো ধরনের শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা সাংবাদিকের কাজ।

আইন অনুসরণ করে বিচারাধীন যে কোনো মামলার 'ফলোআপ' প্রকাশ করা সাংবাদিকের দায়িত্ব। অর্থাৎ একজন সাংবাদিক তাঁর দায়িত্ব পালনের নীতিমালার ভিত্তিতেই চলমান বিচারাধীন মামলার খবর প্রকাশ করবেন। এক্ষেত্রে ওই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চেপে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমন: বাংলাদেশের ইতিহাসে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ বিচার প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি সাংবাদিকরা কাভার করেছেন, যা ছিল যথাযথ। আবার সাংবাদিকতার মাধ্যমে এ বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করারও একটা প্রচেষ্টা ছিল।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশের সব পর্যায়ের সাংবাদিকরা ব্যস্ত সময় পার করেন। নির্বাচনবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নির্বাচনি আইন, বিধিমালা ও আচরণবিধি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত থেকে সংবাদ পরিবেশন করা জরুরি। এ বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় ছিল।

এবারের নিরীক্ষাকে সাজানো হয়েছে আইনবিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে। এ বিটের সঙ্গে যুক্ত সিনিয়র সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের লেখা ও মতামত সংখ্যাটিতে যুক্ত করা হয়েছে–যা পাঠক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও গবেষকদের জ্ঞান আহরণের পরিধিকে সমৃদ্ধ করবে।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

ISBN: 978-984-35-4812-2

** প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৩*

সূচিপত্র

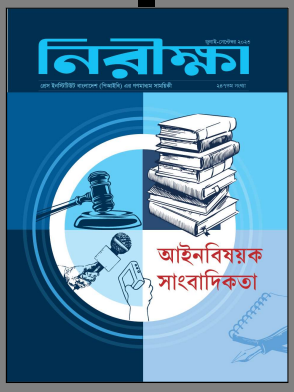

ন্যায়বিচার নিশ্চিতে গণমাধ্যমের অবদান ৩
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

আইন, সাংবাদিকতার মূলনীতি ও নৈতিকতার সমন্বয় প্রয়োজন —ড. মিজানুর রহমান ৭
মোহাম্মাদ এনায়েত হোসেন

বাক্‌স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতা: মানবাধিকার প্রেক্ষিত ১২
ড. শাহজাহান মন্ডল

সাংবাদিকতায় চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ ১৫
প্রফেসর ড. রেবা মন্ডল

আদালত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতারও বড়ো খনি ১৭
জুলফিকার আলি মাণিক

সংবাদপত্রে কোর্ট রিপোর্টিংয়ের অনুষঙ্গ ২১
আলী আসগর স্বপন

আইনবিষয়ক সাংবাদিকতার উৎকর্ষ ও কর্মপরিধি বেড়েছে ২৩
ওয়াকিল আহমেদ হিরন

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত বিচার দেখা জীবনের সবচেয়ে সার্থকতা ২৬
শামীমা আক্তার

আইন ও বিচারালয় সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় নীতিমালা ৩০
মো. মিনহাজ উদ্দীন

৩৩ সাইবার পরিসরে সাংবাদিকতা চিন্তার স্বাধীনতা বনাম আইনি সতর্কতা
শুভ কর্মকার

৩৮ গণমাধ্যমে বিদ্যমান আইন এবং সাংবাদিকের করণীয়
আবুজার

৪৪ ২৮ সেপ্টেম্বর: বাঙালির পাখি দেখার দিন!
রেজা সেলিম

৪৭ সাংবাদিকতায় দেশপ্রেম
শরিফুজ্জামান পিন্টু

৫৫ নির্বাচন ও আচরণ বিধিমালা
জেসমিন টুলী

৬২ নির্বাচন ঘিরে বাড়ছে ভুয়া খবর: ফ্যাক্ট চেকিং জরুরি
রুহুল আমিন রুশদ

৬৭ অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের আলোকে বঙ্গবন্ধুর মানস
মো. ইমরুল কায়েস

৭৪ তথ্যের ভার বহিবার শকতি
জাফর ওয়াজেদ

৭৭ গণমাধ্যম সংবাদ

৮৫ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র সকল প্রকাশনা পেতে: প্রকাশনা কর্মকর্তা পিআইবি, বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

অনলাইনে: www.rokomari.com

মূল্য ৫০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

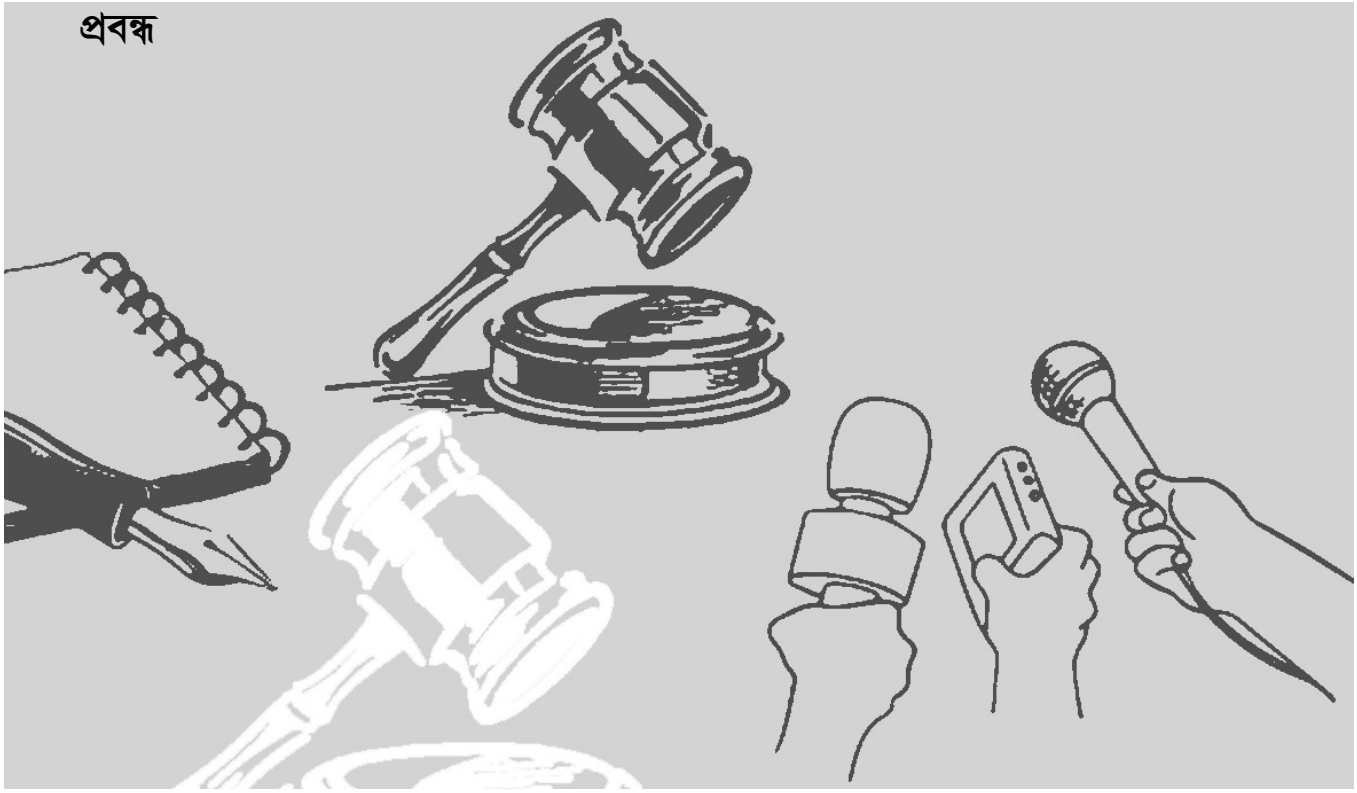

ন্যায়বিচার নিশ্চিতে গণমাধ্যমের অবদান

■ বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

সংগত কারণেই গণমাধ্যমকে বলা হয় রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণমাধ্যম প্রশাসনের অংশ না হলেও রাষ্ট্রের সব বিষয়ে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভূমিকা মঙ্গলসূচক হলে অতি উত্তম। অন্যদিকে বিরূপমুখী প্রচারণা একটি রাষ্ট্রের জন্য হতে পারে অতিশয় বিড়ম্বনার কারণ। পাশ্চাত্য জগতে এমন একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে, গণমাধ্যম বহুলাংশে আণবিক শক্তির মতো। মঙ্গল কাজে ব্যবহার করা হলে এটি যেমন অকল্পনীয় উপকার সাধন করতে পারে, ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসাবেও এটি প্রলয় ঘটাতে পারে নিমিষেই।

বিচারিক জগৎ হচ্ছে একটি বিশেষ এলাকা, যেখানে গণমাধ্যম অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধরনের অবদান নিয়ে হাজির হতে পারে।

২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতির নিমন্ত্রণ পেয়ে বাংলাদেশের সেসময়ের প্রধান বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের কয়েকজন বিচারপতি অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে যাই। অনেক কথার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতি এমন একটি কথা বলেছিলেন, যা শুনে আমরা সবাই পুলকিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ ও ভারতে জুডিশিয়াল অ্যাকটিভিজম (বিচার বিভাগীয় কর্মতৎপরতা) এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলার তত্ত্ব যে গতিতে প্রসারিত হচ্ছে, তা দেখে অস্ট্রেলিয়ার বিচারপতিরা ঈর্ষান্বিত। তিনি

আরও জানিয়েছিলেন, তারা প্রতিনিয়ত ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন আইনি জার্নাল পেয়ে থাকেন, যেগুলোয় বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের উভয় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ রায়গুলো প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আমি হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি থাকাকালে বেশকিছু জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলার রায় দিতে পেরেছিলাম। আমার জানামতে এবং অন্যদের ভাষ্যমতে, সেগুলো সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে এবং জুডিশিয়াল অ্যাকটিভিজম তত্ত্বকে শক্ত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসব মামলার প্রায় সবকটিই স্বতঃপ্রণোদিত, আইনের ভাষায় যাকে সুয়োমোটো বলা হয়। যেহেতু এসব মামলায় কোনো বাদী থাকে না, তাই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা জানার একমাত্র পথ হচ্ছে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর।

এমনই শত শত সুয়োমোটো মামলার মধ্যে বেশ কয়েকটির কথা সব সময়ই মনে রাখার মতো। আমি প্রতিদিন সকালে নাশতা করার সময় অনেক দৈনিক পত্রিকায় চোখ বোলাতাম। যখনই এমন কোনো ঘটনা দৃষ্টি কাড়ত, যার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত রুল জারি করা প্রয়োজন, আদালতে গিয়ে সর্বপ্রথম সেই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুল জারি করে তাদের তলব করতাম। শুনানির পর যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। যা হতো হয় জেলে পাঠিয়ে অথবা জরিমানা করে।

২০১১ সালের কথা। পত্রিকা খুলে দেখলাম আব্দুল কাদের নামক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের শেষ বর্ষের এক ছাত্র রাত ৩টায় তার বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে সবুজবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে থানায় নিয়ে এমন প্রহার করেছে যে তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। সেদিনই সবুজবাগ থানার ওসি এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের সেই অঞ্চলের উপকমিশনারকে তলব করে রুল জারি করেছিলাম। একই সঙ্গে সেই ছাত্রকে ডেকেছিলাম তার অবস্থা স্বচক্ষে দেখার এবং তার বক্তব্য শোনার জন্য। একটি হুইলচেয়ারে অন্যের সাহায্য নিয়ে আদালতে পৌঁছে গায়ের জামা খোলার পর তার ওপর নির্যাতন যে কতটা বর্বরোচিত ছিল, তা আঁচ করতে অসুবিধা হয়নি। তিনি বলেছিলেন, থানার ওসি নিজে একটি তরোয়ালসম অস্ত্র দিয়ে তার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল, ঝরছিল প্রচুর রক্ত। ওসি নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করলেও এটা মেনে নিয়েছিল যে, রাত ৩টায় ওই ছাত্র চলাফেরা করায় ওসির সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। থানায় নেওয়ার ঘটনা স্বীকার করার পর নির্যাতনের ঘটনায় অস্বীকৃতি আর ধোপে টেকে না, বিশেষ করে ওসি যখন নির্যাতকের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ডিএমপির উপস্থিত উপকমিশনারকে আদেশ দিলাম আদালত কক্ষ থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওসিকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩২৬, ৩০৭ ধারায় এজাহার করতে। পরে বিচারিক আদালত ওসিকে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। অন্যদিকে কাদের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কলেজে প্রভাষকের চাকরি পেয়েছিলেন।

আরেক প্রত্যুষে পত্রিকায় দেখলাম শরীয়তপুরে নীহার নামক এক যুবতিকে সালিশের নামে বিচারের তথাকথিত রায় বাস্তবায়নে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। সেই যুবতি অসৎচরিত্রের, এই মর্মে অভিযোগের কারণে তাকে বেত্রাঘাতে হত্যা। কিন্তু খবরটি প্রকাশিত হওয়ার সাতদিন আগেই নীহারকে কবরস্থ করা হয়েছিল। আমি সেদিনই শরীয়তপুরের ডিসি এবং পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছিলাম কালবিলম্ব না করে নীহারের মরদেহ কবর থেকে উত্তোলন করে আমাদের আদেশে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল বোর্ডে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা, যে বোর্ডের প্রধান হিসাবে নির্ধারণ করেছিলাম দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রওশন আরাকে, যিনি তখন হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধানরা ছিলেন সেই বোর্ডের অন্য দুজন সদস্য। লাশ উত্তোলনের দায়িত্বে প্রশাসনের পক্ষে যে নারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তার কথা ভোলার নয়। তিনি আদালতে এসে বলেছিলেন, সাতদিন আগে কবর দেওয়া লাশ উত্তোলন ছিল খুবই কষ্টকর। পচাগলা লাশের দুর্গন্ধে পুরো এলাকা হয়ে পড়েছিল নরকতুল্য। জানি না সেই ম্যাজিস্ট্রেট এখন কোথায় আছেন, সম্ভবত এরই মধ্যে অবসরে চলে গেছেন। তবে এক দুরূহ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তিনি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। কয়েকদিন পর বিশেষভাবে গঠিত ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হলো যে, বেত্রাঘাতের কারণেই নীহারের মৃত্যু হয়েছিল, অথচ শরীয়তপুরের সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বোর্ড নীহারের স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রতিবেদন দিয়েছিল। বিশেষজ্ঞ বোর্ডের প্রতিবেদন পাওয়ার পর শরীয়তপুরের সিভিল সার্জন এবং সেই দুই চিকিৎসকের কথা শুনে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দুজন অধস্তন চিকিৎসক বললেন, সিভিল সার্জন স্যার যেভাবে রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছেন, সেভাবেই তারা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। আর সিভিল সার্জন বললেন, কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির নির্দেশে তিনি কাজ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, গ্রামগঞ্জে এ ধরনের ফরমায়েশি ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন সব সময়ই হয়ে থাকে। নিশ্চুপ হয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম–খুনের মামলায় ময়নাতদন্ত রিপোর্টের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না, আর তা যদি অহরহ প্রভাবশালীদের নির্দেশ মোতাবেক তৈরি হয়, তাহলে কটি খুনের ন্যায়বিচার হয়ে থাকে? উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম আদালত কক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জন এবং অন্য দুই ডাক্তারকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে মামলা করতে, যার ফলে তাদের সবারই সাজা হয়েছিল। পাশাপাশি সালিশকারীদেরও গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দিই।

আমার দেওয়া সুয়োমোটো বিচারের অন্যতম ছিল হাতিরঝিল এলাকায় স্থাপিত বিজিএমইএ ভবন ভাঙার নির্দেশ। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশ গার্মেন্টস মালিক সমিতি পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে ভবনটি নির্মাণ করেছে। রুল জারির পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে যা জেনেছিলাম, তা আরও ভয়াবহ। অর্থাৎ, যে জমিতে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে, বিজিএমইএ মোটেও সেই জমির মালিক নয়। ঢাকার ডিসি জমিটি অধিগ্রহণ করেছিলেন রেল কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের জন্য পুরো জমিটির প্রয়োজন হয়নি বলে কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে সেটি বিজিএমইএ-এর কাছে বিক্রয় করেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা হলো–অধিগ্রহণ করা জমি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা না গেলে সেই অবশিষ্ট জমি যাদের থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তাদের কাছে ফেরত দিতে হবে অথবা অন্য কোনো জনমঙ্গলকর কাজে তা ব্যবহার করতে হবে। বিজিএমইএ একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। এখানে জনমঙ্গলের উপাদান থাকতে পারে না। তাই ভাঙার আদেশ দিয়েছিলাম। আপিল বিভাগও আমাদের রায় বহাল রেখেছিলেন। বিভিন্ন পন্থায় সময়ক্ষেপণ করলেও সবশেষে বিজিএমইএ বাধ্য হয়েছিল নিজ খরচে ভবনটি ভেঙে ফেলতে–যখন বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষের ওপর আদালত অবমাননার রুল জারি করা হয়েছিল।

বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে আমার নেতৃত্বের বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত রুল ইস্যু করে মালিকদের সাজা দিয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ল্যাবএইড হাসপাতাল। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জেনেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী মৃদুল চক্রবর্তী উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে ল্যাবএইড

অনেক কথার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতি এমন একটি কথা বলেছিলেন, যা শুনে আমরা সবাই পুলকিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ ও ভারতে জুডিশিয়াল অ্যাকটিভিজম (বিচার বিভাগীয় কর্মতৎপরতা) এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলার তত্ত্ব যে গতিতে প্রসারিত হচ্ছে, তা দেখে অস্ট্রেলিয়ার বিচারপতিরা ঈর্ষান্বিত

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে তাকে কয়েক ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হলে তিনি জলশূন্যতার কারণে মারা যান। তলব করেছিলাম ল্যাবএইড হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডা. শামীম, তার স্ত্রীসহ হাসপাতালের সব পরিচালককে। সবাই অবহেলার অভিযোগ অস্বীকার করলেও অধ্যাপক চক্রবর্তীর এক ভাগিনা, যিনি নিজেও একজন চিকিৎসক এবং তার মামাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তার ভাষ্যমতে হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তাররা যথাসময়ে অধ্যাপক চক্রবর্তীর চিকিৎসা শুরু করে স্যালাইন প্রদান করলে তিনি জলশূন্যতায় (ডিহাইড্রেশনে) মারা যেতেন না। আমি ল্যাবএইডের মালিককে আদেশ দিয়েছিলাম তাৎক্ষণিক অধ্যাপক চক্রবর্তীর পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা প্রদান করতে এবং তা না দেওয়া পর্যন্ত তাদের আদালতের কাঠগড়ায় বন্দি হয়ে থাকতে। তারা আদালতের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সময়ক্ষেপণ না করে অধ্যাপক চক্রবর্তীর পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা প্রদান করে মুক্তি পেয়েছিলেন।

প্রায় কাছাকাছি সময়ে পত্রিকায় খবর এলো যে, জামায়াতের মালিকানাধীন ইবনে সিনা হাসপাতালে অবহেলাজনিত কারণে একাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই হাসপাতালের চেয়ারম্যান, কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী (যুদ্ধাপরাধ মামলার রায়ে যার পরবর্তী সময়ে ফাঁসি হয়েছে) মীর কাসেম আলী, হাসপাতালের অন্য পরিচালকদের এবং পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে তলব করে শুনানির পর উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাকে আদেশ দিয়েছিলাম মীর কাসেম আলীসহ ইবনে সিনা হাসপাতালের অন্যান্য পরিচালককে আদালত কক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করতে। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাপরাধ মামলায় গ্রেফতার হওয়ার আগে আমার নির্দেশে গাফিলতির দ্বারা দুই শিশুকে হত্যার জন্যই সে প্রথম গ্রেফতার হয়েছিল।

এক ভোরে একটি ইংরেজি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকজুড়ে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত দখলের ছবির নিচে লেখা ছিল সৈকত জবরদখল করে সেখানে হোটেল নির্মাণ করছেন কর্নেল অলি, বীরবিক্রম। আমার নির্দেশে আদালতে হাজির হতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কি না? গর্বভরেই ইতিবাচক জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটি ঠিক কি না। তখন তার মুখ থেকে আর কথা বের হলো না। আমতা আমতা করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিলেন। এরপর যখন বললাম, একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল করতে কি তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি? তখন মাথা নিচু করে তিনি মাটির দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি তাকে এই বলে মুক্তি দিয়েছিলাম যে, একজন মুক্তিযোদ্ধা বলেই তাকে ছেড়ে দিলাম, নয়তো সোজা নাজিমুদ্দিন রোডে (কেন্দ্রীয় কারাগারে) পাঠাতাম, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে কালই তার স্থাপনা ভেঙে না ফেললে তাকে জেলে পাঠাব। তিনি অবশ্য পরদিনই তার স্থাপনা চুরমার করতে শুরু করেছিলেন।

২০১২ সালের এক সকালে একটি অপ্রত্যাশিত খবরে জানলাম যে একটি জেলা শহরে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অফিসাররা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এক মন্দির দখল করেছে। খবরটি এজন্য বিব্রতকর ছিল যে, সেই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল। তাই এ পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগ সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রথমে সেই জেলার ডিসিকে তলব করলে ডিসি ভদ্রমহিলা খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। এরপরই আব্দুল জলিলসহ ব্যাংকের সব পরিচালককে তলব করেছিলাম। তবে জলিল সাহেবের আইনজীবী আব্দুল মতিন খসরু (প্রয়াত) এই মর্মে জানালেন যে, জলিল সাহেব এতটাই অসুস্থ যে তিনি হুইলচেয়ার ছাড়া চলাচলে অক্ষম, তাই তাকে উপস্থিত হওয়ার দায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ডিসির প্রতিবেদন থেকে জানতে পেরেছিলাম যে দখল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের হেড অফিস কিছুই জানত না। পুরো ঘটনার জন্য দায়ী ছিল সংশ্লিষ্ট শাখার অত্যুৎসাহী ম্যানেজার। তাছাড়া হেড অফিস জানার পর শুধু দখলই ছেড়ে দেয়নি, মন্দির কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণও দিয়েছিল।

একটি বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত রুল ইস্যু করেও সেটি শেষ করতে না পারার দুঃখ আমি কখনো ভুলতে পারব না। ২০১৩ সালে একটি বাংলা দৈনিকে একজন সাংবাদিকের লেখা থেকে জেনেছিলাম যে, ২০০১-২০০৪ সালে খালেদা জিয়া তার দলের নেতাদের মধ্যে অকাতরে নামমাত্র মূল্যে জমি বিতরণ করেছেন বেগুনবাড়ী এবং তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে। বিলিয়ে দেওয়া জমি যেসব ভাগ্যবান ব্যক্তি পেয়েছেন বলে পত্রিকাটিতে নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, তারা বিএনপির সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেজর কামরুল, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জিয়াউর রহমান জিয়া, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের স্ত্রী ও শফিক রেহমান। প্রথম দিনই সেই চারজনকে তলব করলে তাদের আইনজীবী, অ্যাডভোকেট টিএইচ খান অনেকটা স্বীকারোক্তির সুরেই বললেন, অন্য যারা একইভাবে জমি নিয়েছেন, তাদের সবাইকে ডাকতে হবে। পত্রিকার প্রতিবেদনে সবার নাম না থাকায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে তালিকা

চাইলে তিনি মোট ২৪ জনের একটি তালিকা আমাদের কাছে পাঠালেন। তাদের সবাইকে তলব করেছিলাম। জমিপ্রাপ্তদের অনেকেই পর্বতপ্রমাণ বিত্তশালী বিধায় সেসময়ের অর্থসচিব (পরে দুদকের চেয়ারম্যান) ইকবাল মাহমুদের নেতৃত্বে সচিব, অতিরিক্ত এবং যুগ্মসচিবের সমন্বয়ে মোট চারজনের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলাম। অন্য তিনজন ছিলেন আইন সচিব জহিরুল হক দুলাল (প্রয়াত), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিব (নাম মনে নেই) এবং একই মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব নাজিমুদ্দিন চৌধুরী (যিনি পরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে উন্নীত হয়েছিলেন)। এই চার সচিব একটি নির্ভুল এবং অখণ্ডনযোগ্য প্রতিবেদন দিয়ে শুধু সবার অপরাধের কথাই উল্লেখ করেননি বরং গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও ফৌজদারি ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। নির্ধারিত দিনটিতে অন্য একটি মামলার জন্য আদালতে উপস্থিত সেসময়ের রাজউক চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানিয়েছিলেন বিজ্ঞপ্তি ছাড়া সরকারের একবিন্দু জমিও কারও কাছে হস্তান্তর করা বেআইনি এবং অপরাধমূলক। এর কদিন পরেই আমি আপিল বিভাগে উন্নীত হওয়ার কারণে এই মামলাটি নিষ্পত্তি করতে না পারার বেদনা এখনো রয়ে গেছে। শুনেছি আর্থিক ক্ষমতায় বলীয়ান বিবাদীরা বেশ কিছুকাল ফাইলটি গায়েব করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তবে অবশেষে সম্প্রতি হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে মামলাটির শুনানি শেষ হয়েছে বলে জানতে পেরেছি এবং এখন রায় অপেক্ষমাণ।

সদরঘাট এলাকা থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত পথটি হকাররা দখল করে রাখায় প্রচুর যানজটের কারণে যান চলাচল অসম্ভব, এই মর্মে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়েছিলাম সাতদিনের মধ্যে সব হকার উচ্ছেদ করে রাস্তা পরিষ্কার করতে। এরপর সদরঘাট থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছতে মাত্র ১০ মিনিট সময় লাগত বলে সবাই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে এখন নাকি সেই আগের অবস্থাই বিরাজ করছে।

২০১২ সালে খবর প্রকাশিত হলো যে কেরানীগঞ্জ এলাকায় সাত বছরের এক শিশুকে অপহরণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রুল ইস্যু করার পর সেসময়ের ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান (বর্তমানে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার) শিশুটিকে উদ্ধারের জন্য সব দক্ষতা এবং ক্ষমতা নিয়ে নেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে তার কৃতিত্ব ভোলার মতো নয়।

একদিন পত্রিকায় এই মর্মে একটি ধিক্কৃত খবর প্রকাশিত হলো যে বিক্রমপুরের লৌহজং উপজেলায় একটি মন্দিরে কয়েকজন জঙ্গি প্রতিমা ভাঙচুর করে হাতেনাতে ধরা পড়ার পরও পরদিনই মুন্সিগঞ্জের প্রধান বিচারিক হাকিম তাদের জামিনে মুক্তি দিয়েছিলেন। ঘটনাটি অগ্রহণযোগ্য মনে করে সঙ্গে সঙ্গেই তলব করেছিলাম সেই মুখ্য বিচারিক হাকিমকে। আদালতে আসার পর তাঁকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বললে সেসময়ের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম (যিনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন) বললেন 'মাই লর্ড, তিনি একজন বিচারিক কর্মকর্তা, তাঁকে কাঠগড়ায় তোলা ঠিক হবে না।' আমি তাঁর কথার জবাবে বলেছিলাম, বিচারিক কর্মকর্তা বলে তাঁর দায় অন্যের চেয়ে অধিক, আর সেজন্য তাঁকে কোনো আলাদা মর্যাদা দেওয়া যাবে না। আমি সেই আসামিদের জামিন বাতিল করে আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়েছিলাম।

একদিন বেশ কয়েকটি পত্রিকার খবরে জানলাম যে মহাস্থানগড় এলাকায় ঐতিহাসিক স্থাপনা ভেঙে একটি নতুন মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে। সেই জেলার ডিসি, পুলিশ সুপারসহ অন্য সংশ্লিষ্টরা আমাদের আদেশে আদালতে উপস্থিত হয়ে জানিয়েছিলেন যে নামাজ আদায়কারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আরও মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে জেলার প্রশাসন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানালেন যে ঐতিহাসিক এলাকার বাইরেও মসজিদ নির্মাণের জন্য যথেষ্ট জমি রয়েছে, যেখানে মসজিদ বানালে মহাস্থানগড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অন্যদিকে নামাজ আদায়কারী মুসল্লিদেরও সমস্যা হবে না। আমি শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন এবং শিল্পী হাশেম খানের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার পর ওই কমিটি একটি নিখুঁত প্রতিবেদনের মাধ্যমে উল্লেখ করেছিল, আগের মসজিদটির অতি নিকটেই অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে নতুন মসজিদ তৈরি করা সম্ভব এবং এর ফলে মুসল্লিদের প্রয়োজন যেমন মিটবে, ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ও থাকবে অক্ষত। প্রতিবেদনে তারা উল্লেখ করেছিলেন যে, কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী লোক তাদের চেতনাগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই গড়ের ভেতরে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেখানে নিকটেই, অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এলাকার বাইরেই অনেক জমি ছিল। এসব ধর্মান্ধের আসল উদ্দেশ্য ছিল গড়টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

একদিন পত্রিকার খবরে জানলাম যে খুলনার সবচেয়ে বড়ো মহাসড়কের নাম 'খান এ সবুর রোড'। খবরটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবাইকেই উৎকণ্ঠিত করতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গেই রুল ইস্যু করে শাহরিয়ার কবির এবং অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনকে বলেছিলাম আদালতকে সহায়তা করতে। চূড়ান্তভাবে মামলাটি নিষ্পত্তি করে 'খান এ সবুর'সহ অন্য সব রাজাকারের নাম স্থাপনা থেকে সরিয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু বহু পরে জানতে পেরেছিলাম, সবুর খান নামফলক সরানো হয়নি। তাই অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল অবজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার। তিনি সেটি করার পর অবশ্য নামফলকটি সরানো হয়েছে।

একদিন খবর প্রকাশিত হলো যে কে বা কারা শহিদ মিনারে একটি লাল সালু ফেলে সেখানে একটি মাজার তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবিরসহ অন্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের আদালতে আসতে বলে তাদের উপস্থিতিতেই মাজার তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ করার আদেশ দিয়ে ওই ব্যক্তিদের বলেছিলাম এ বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখতে। কিঞ্চিৎ তৈরি স্থাপনা গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এরপর দুষ্কৃতকারীরা আর সাহস পায়নি সেদিকে পা বাড়াতে।

এমনি বহু স্বতঃপ্রণোদিত রুল জারি করতে পেরেছিলাম হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসাবে। বহু নদী, খাল এবং জলাধার দখলমুক্ত করার জন্যও অনেক আদেশ দিয়েছিলাম, যার ফিরিস্তি দিতে গেলে দিনের পর দিন চলে যাবে, আর সেগুলো সম্ভব হয়েছিল গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রবাহের কারণে। তাই কৃতিত্ব বহুলাংশে গণমাধ্যমকর্মীদের।

স্বতঃপ্রণোদিত রুল জারির পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে সাধারণ মানুষ, আইনজীবীরাও অনেক বিষয় আদালতের নজরে আনেন। আমি নিজেও এমন অনেক ঘটনায় যথাযথ আইনি প্রতিকার করতে সচেষ্ট থেকেছি। গণমাধ্যমের আরেকটি ভূমিকা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই সেটি হলো–ন্যায়বিচার কেবল নিশ্চিত হলেই হয় না, ন্যায়বিচার যে নিশ্চিত হয়েছে সে বার্তাটি জনগণের মাঝে পৌঁছে দিয়ে আইনের শাসন কায়েমে গণমাধ্যমের অবদান। আইনের শাসন কায়েমে গণমাধ্যমের এই ভূমিকা বিশ্বজুড়েই স্বীকৃত।

লেখক: আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

সাক্ষাৎকার

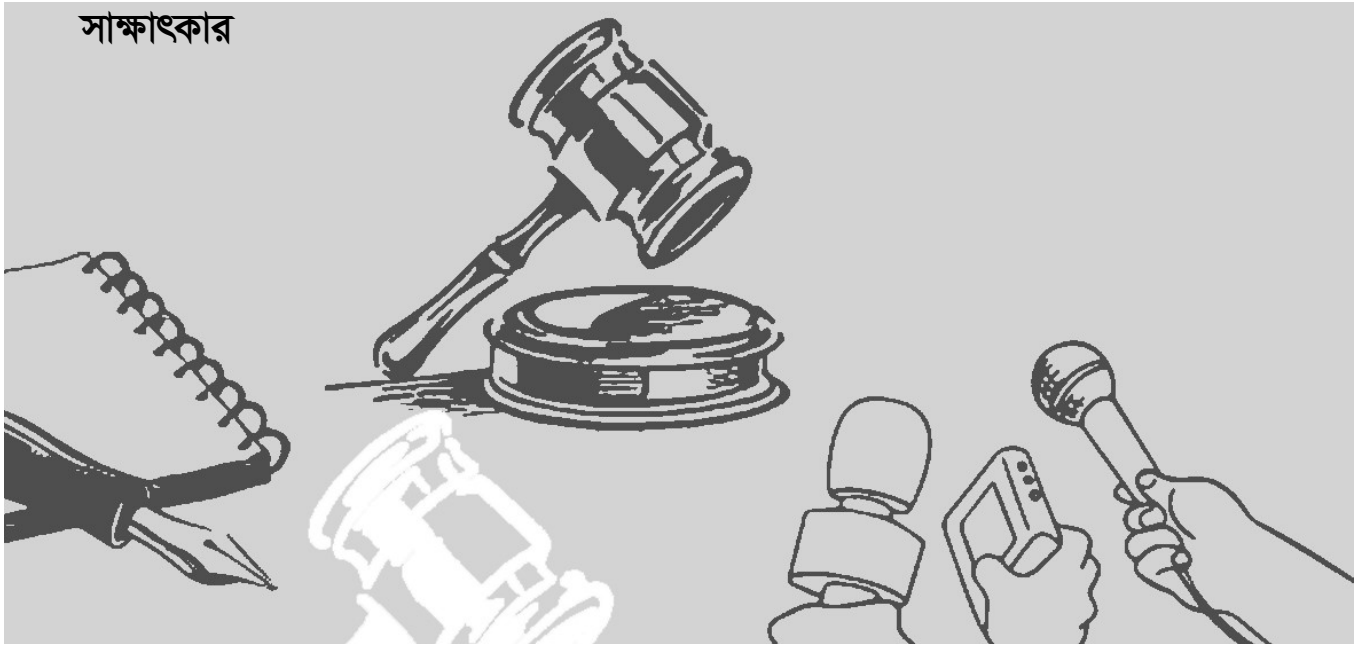

আইন, সাংবাদিকতার মূলনীতি ও নৈতিকতার সমন্বয় প্রয়োজন

— ড. মিজানুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সাবেক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে মানবাধিকারের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে উঠে আসেন আলোচনায়। বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশে তিনি মানবাধিকারের পক্ষে অন্যতম কণ্ঠস্বর। আইন, নৈতিকতা, মানবাধিকার এবং সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে নিরীক্ষার পক্ষ থেকে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গবেষক **মোহাম্মাদ এনায়েত হোসেন**।

এনায়েত হোসেনঃ আইন এবং সাংবাদিকতা–বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

ড. মিজানুর রহমানঃ দেখুন, আইন ও সাংবাদিকতাকে আমরা দুভাবে দেখতে পারি। একটি হচ্ছে, সাংবাদিকতার ওপর আইনের প্রভাব আর অন্যটি–আইনি যে কর্মকাণ্ড হয় আদালতে বা আদালতের বাইরে, সেগুলো সাংবাদিক কীভাবে গ্রহণ-সংরক্ষণ করেন এবং কীভাবে আমাদের পাঠকের কাছে, মানুষের মধ্যে তথ্যটি ছড়িয়ে দেন।

এ দুটি জায়গায় যেমন প্রশ্ন আছে আইনের, তেমনই আছে নৈতিকতারও। আমার বিশ্বাস, সাংবাদিকতার যে নৈতিকতা ও মূলনীতি, সেগুলো অবশ্যই সেখানে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের দেশে প্রধানত যা হয়–একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখেন গভীরে না গিয়ে, ঠিক সেভাবেই আমাদের সাংবাদিকরা আইনকে গ্রহণ করে এর ওপরই আলোকপাত করার চেষ্টা করেন। এতে অনেক সময় আদালত যে পর্যবেক্ষণ করছেন বা যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, আইন না বুঝে সেই কথাগুলোই প্রচার

করা হয়। তখন একটা ভুল বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে এবং সেটা একটা ভয়াবহ পরিণাম-বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে সমাজে। আমার কাছে মনে হয়, আমাদের সাংবাদিকরা আইন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না; আইনবিষয়ক গবেষণা তাঁরা করেন না। কোনো একটা সিদ্ধান্ত যখন আদালত দিচ্ছেন, একটা আইনানুগ প্রশ্ন যখন আদালতে উঠছে; সেটি নিয়ে যেমন আমরা প্রায়ই বলি–এটা সাবজুডিস। যে মামলা সাবজুডিস, সেই মামলার পক্ষদ্বয় ও বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা হয়তো কোনো কথা বলতে পারব না। এর মানে এ নয় যে–সমস্যাকেন্দ্রিক কোনো কথাই আলোচনা হতে পারে না।

যে কোনো সামাজিক সম্পর্ককে ভিত্তি করেই তো সমস্যা সৃষ্টি হয়। সে সমস্যাটি কেন্দ্র করে দুজন ব্যক্তি বা দুটি পক্ষের ভেতর বিরোধের সৃষ্টি, ভুল বোঝাবুঝি, আইনের প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ–সবকিছুই হতে পারে।

এই পার্টিকুলার প্রবলেম যদি আমি এড়িয়ে না যাই, এটি নিয়ে যদি আমি গবেষণা করি, প্রবন্ধ লিখি এবং গবেষণা করে যদি তুলনামূলক আলোচনায় যাই–সমস্যাটিকে সাধারণত আইনি ব্যবস্থায় কীভাবে দেখা হয়, আমাদের প্রচলিত আইনব্যবস্থায় কী রকম দেখা হয়, ভিনদেশের আইনব্যবস্থায় কী রকম হয়, আমাদের আইনব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যেসব রাষ্ট্র, সেখানে কীভাবে দেখা হয়; তাহলে এগুলো কিন্তু কখনোই সাবজুডিস হিসাবে আদালত অবমাননা হবে না। সতর্কতার দোহাই দিয়ে কঠিন কাজটি এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কঠিন কাজটি হচ্ছে অধ্যয়ন, গবেষণা ও পড়াশোনার কাজ। আমাদের মধ্যে যতটা পারি কম পরিশ্রম করে কোনো একটা জিনিসের শেষ যে লক্ষ্য, সেটায় উপনীত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আমার মনে হয়, সাংবাদিকতার যে ম্যাচুরিটি বা একজন সাংবাদিকের যে ম্যাচুরিটি, এটির সঙ্গে তা জড়িত। আপনি লক্ষ করবেন, দেশে যারা সাংবাদিকতাকে পড়াশোনা হিসাবে নিয়েছেন, যাঁরা সাংবাদিকতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যে সবাই সাংবাদিক তা কিন্তু নয়।

সাংবাদিকতা পড়ে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন, রাজধানীকেন্দ্রিক প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া অঙ্গনে তাদের অনেককেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মফস্সল এলাকায় গেলে দেখি–যে কেউ সাংবাদিক হতে পারেন। যে কেউ সাংবাদিক হতে পারেন–এটা একটা ধারণাতে আছে, হতেই পারে। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি একটা সংবাদকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারি, তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, সেই তথ্য বর্ণনা করতে পারি, বিতরণও করতে পারি। এটাও সাংবাদিকতার একটা অংশ হতে পারে। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই সেই সাংবাদিকতার কথা বলছি না। আমরা বলছি যেটি তথ্যবহুল, নিরীক্ষামূলক, পরীক্ষামূলক, গবেষণাভিত্তিক এবং মূল কথা–সেটা সত্যের অপলাপ নয়। যেটা কোনোভাবে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হয় না। জিনিসগুলো যদি খেয়াল রাখা হয়, সেই ক্ষেত্রে মনে হয় যে–আমাদের অনুশীলন ও চর্চার যথেষ্ট ঘাটতি আছে। এ দিকটায় বোধহয় আমাদের নজর দেওয়া দরকার।

এনায়েত হোসেন: একজন সাংবাদিক আইনবিষয়ক সাংবাদিকতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চাইলে আপনার পরামর্শ কী?

ড. মিজানুর রহমান: আপনি যদি বড়ো সংবাদপত্রগুলো দেখেন, যেমন: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, গার্ডিয়ান; আপনি দেখবেন, এগুলোয় যাঁরা আদালতকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা করেন বা আইন নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা কিন্তু সেখানে বিশেষজ্ঞ। এর বাইরে অন্য কোনো সাংবাদিকতায় তাঁরা যান না। তাঁদের ওখানেই রাখা হয়। তাঁকে বলা হয়, তোমার কাজ হলো ওখানে যা কিছু তথ্য পাবে এবং মামলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাবে, যা কিছু দরকার সেভাবে নিজেকে তৈরি করে আমাদের সংবাদ পরিবেশন করবে। তাই তাঁদের কাছ থেকে যে সংবাদগুলো পাই, আমাদের মনে হয় যে একজন বিশেষজ্ঞ যেন আমাদের এ কথাগুলো বলেছেন; যাঁর ওপর আস্থা রাখা যায়। এ জায়গাটি আমাদের এখানে দেখি না। আমরা দেখি, একই সংবাদ বিভিন্নভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে। মনে করুন, দুর্নীতি দমনের ওপর একটি মামলা হয়েছে। সেখানে অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম যখন কথা বলছেন, উনি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন, তাঁর প্রতিপক্ষ অভিযুক্তের পক্ষের যারা আইনজীবী, তাঁরা অন্যভাবে বক্তব্য দিচ্ছেন আর আমাদের সাংবাদিকরা কীভাবে সেই তথ্যটিকে পরিবেশন করছেন। একপেশে পরিবেশনের প্রবণতা আমরা লক্ষ করি। সংবাদপত্র রাইট টু দ্য সেন্টার নাকি লেফট টু দ্য সেন্টার, সেটার ওপর ডিপেন্ড করে। তাঁরা একটু পরিমার্জন করে উপস্থাপন করেন। যাতে আপনি ধরতে পারবেন না এই খবরটা এভাবে দিলেন কেন? তাঁরা ভাবেন তাঁদের আটকানো যাবে না, কেননা ওনারা যেটা করেছেন, সেটার মধ্যে অর্ধসত্য আছে। এ অর্ধসত্য লুকানো, এটিকে আপনি কীভাবে দেখবেন? এটি নৈতিকতার প্রশ্ন। এ জায়গাটিতে আমাদের নৈতিকতার দারুণ অভাব রয়েছে। শুধু সাংবাদিকতার জায়গায় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি–আমাদের উচ্চপর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও নৈতিকতার বড্ড অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমি শিক্ষক, আমার কাছে যদি ছাত্ররা নৈতিকতা শিক্ষা না পায়, তাহলে আমার যে ছাত্র সাংবাদিকতা পড়ে সাংবাদিক হয়েছে, সে কোন নৈতিকতা ধারণ করবে বা নৈতিকতা ধারণের প্রয়োজন বোধ করবে কি না–এ প্রশ্ন থেকে যায়।

আমার যেটা সব সময় মনে হয়, রাজনৈতিক স্বার্থ বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থে খবরের কাগজ বা সাংবাদিকতার ব্যবসা করছেন, এই ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত, সেই মিডিয়া হাউজগুলোকে নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি মিডিয়া হাউজে যারা আইন নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের খুঁজে একটা তালিকা করা দরকার। তালিকা করে আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশিক্ষণ দিতে পারি।

যারা আইন জানেন, কোন আইনটি কী রকম, কোন আইনে কী নীতিমালা, কোন আইনটিকে কীভাবে দেখা উচিত, আইনের দুর্বল জায়গাগুলো কোথায়, এগুলো নিয়ে তাঁদের সঙ্গে একটা আলাপ-আলোচনা হতে পারে। এটা ঠিক যেভাবে এনজিওগুলো প্রশিক্ষণ দেয়, ওরকম ভাবার প্রয়োজন নেই। কেননা সাংবাদিকরা যথেষ্ট জ্ঞানী। তাঁরাও যথেষ্ট জানেন।

কিন্তু এই যে খোলাখুলি তথ্যের আদান-প্রদান, কথাবার্তা বলা এবং আমি যতটুকু জানি সেটা অন্যকে জানানো এবং তাঁদের কাছে আমার শিক্ষণীয় হলো যে ওখানে কী হচ্ছে, সেটি তাঁদের কাছে জেনে নেওয়া। এই যে আদান-প্রদানের ভিত্তি, এ জায়গাটাকে আরও উন্নত অবস্থায় রূপান্তর করা যায়।

এনায়েত হোসেন: বিচারাধীন কোনো মামলা কতটুকু প্রচার করতে পারব আমরা?

ড. মিজানুর রহমান: আমাদের খুব ভুল একটা ধারণা আছে যে, কোনো কিছু বললেই বুঝি আদালত অবমাননা হয়ে যায়; কিন্তু ফ্যাক্ট সেটা নয়। আদালতের সিদ্ধান্ত আপনি যদি গবেষণামূলকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সমালোচনা করেন, সেটা আদালত অবমাননা নয়। কিন্তু আপনি যদি আদালতকে, বিচারব্যবস্থাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য, মানুষের চোখে সেটাকে শুধু খারাপ দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য সংবাদ পরিবেশন করেন, এ ধরনের প্রবণতা যদি আপনার থাকে এবং এ উদ্দেশ্যটা যদি খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তাহলে সেটা আদালত অবমাননা হবে। এর বাইরে আদালতে যাঁরা বিচারক, তাঁরাও কিন্তু সাংবাদিকদের মাধ্যমে, সমালোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে চান। আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের সমৃদ্ধ করার। কেননা একজন বিচারক সব বিষয়ে পারদর্শী নন, সব বিষয়ে তাঁর জানার কথাও নয়। একটি মামলায় উভয় পক্ষের যে উকিল, তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই একজন বিচারক সিদ্ধান্ত দেন।

এবার আপনি যখন একটা সিদ্ধান্ত পড়বেন, যখন একটি জাজমেন্ট পড়বেন, আপনি দেখবেন এক পক্ষের উকিল এবং আরেক পক্ষের উকিল কী বলেছেন। কী তথ্যপ্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। আদালতের কাছে যেটাকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, এভাবে একটা সিদ্ধান্ত লেখা হয়।

আমাদের দেশে বড়ো সিদ্ধান্ত লেখা হয়। আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত একটি বই হয়ে যায়। আপনি যদি ফ্রান্স বা জার্মানিতে যান, সেখানে দেখবেন সিদ্ধান্ত হচ্ছে দুই লাইনের। কেউ দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে, কেউ দোষী না হলে খালাস পাচ্ছে। আদালত নিজের থেকে নিচ্ছেন না, উনি কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে নিয়ে তাঁদের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করছেন এবং এরপর তিনি দেখাচ্ছেন কোনটি অধিক যুক্তিগ্রাহ্য এবং কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য। এটি গ্রহণ করে তিনি আইন অনুযায়ী রায়টি ঘোষণা করছেন।

যদি আমার উদ্দেশ্য না হয় আদালত কিংবা বিচারককে ব্যক্তিগতভাবে হেয় করা, এগুলো যদি না থাকে, তাহলে আদালত অবমাননা হবে না।

এনায়েত হোসেন: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকতার ভূমিকা কীভাবে দেখেন?

ড. মিজানুর রহমান: গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হলো আইনের শাসন। যেখানে আইনের শাসন থাকে না, সেখানে সুশাসনের অভাব ঘটে। সেখানে নানানরকম অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন দিয়েই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের শাসনের অন্যতম ভিত্তি হলো সঠিক তথ্য প্রচার এবং বিকৃত বা মিথ্যা তথ্য যেন প্রচার না হয়, তা নিশ্চিত করা। আইনের শাসনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইনের সঙ্গে সাংবাদিকতার সম্পর্ক কি তাহলে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা হবে? অনেকেই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার কথা বলেন? আমি কিন্তু নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার বিপক্ষে। কোনো সাংবাদিকই নিরপেক্ষ নন। আপনি পৃথিবীর যত নামকরা সংবাদপত্রের কথাই বলেন না কেন, আমি যে নামগুলো ইতোমধ্যে বলেছি, প্রিন্ট বলুন বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া–কোনোটাই নিরপেক্ষ নয়। আপনাকে হয় ডান, না হয় বাম–একটি গ্রহণ করতে হবে। এখানে আমাকে একটু লেলিনের কথায় আসতে হয়, 'যখন সত্য এবং মিথ্যা, তখন কিন্তু নিরপেক্ষ বলে তৃতীয় কোনো পক্ষে থাকে না। হয় আপনি ডানে যাবেন, না হয় বামে।' যারা বলে আমরা নিরপেক্ষ, তারা সাধারণত ডানের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ডানের দিকে চলে যায়। তারা হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ, তারা হয়ে যায় সাংঘাতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। এটা হচ্ছে বাস্তবতার কথা। যে কোনো সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যম কোনো না কোনো একটি দর্শনকে অনুসরণ করে। সেই দর্শনের ভিত্তিতেই তারা কাজ করে। সেই দর্শনটা কেমন হবে, সেই দর্শনটা কি পুঁজিবাদী? সেই দর্শন কী লক্ষ্যে কাজ করবে? মালিকের স্বার্থে কাজ করবে নাকি সত্যকে আরাধ্য হিসাবে বিবেচনা করে সেই সত্যের অন্বেষণে সাংবাদিকতাকে পরিচালিত করব? এ চয়েজ কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়েছে। যখন আমরা ব্যক্তিমালিকানায় থাকি, তখন ওই চয়েজ প্রয়োগ করার ক্ষেত্র অনেকটা সংকুচিত হয়ে যায়। মনে করুন, ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি সংবাদপত্র যখন থাকে, তখন এই ব্যক্তিমালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক সময় আপনাকে মেনে নিতে হয়, সেটা আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, সেটা সত্য হোক বা না হোক। অনেক কিছু আপনি যদি প্রকাশ না করেন, এই না করাটাই আপনার ভেতরে কুরে কুরে খাবে।

আপনি যেন নিজের সঙ্গে একটা কম্প্রোমাইজ করে চলছেন। যেখানে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত, সেখানে আপনি চুপচাপ রয়েছেন, কেননা এটা যদি প্রকাশিত হয়, তাহলে সেটা যাঁরা মালিকপক্ষ, যাঁরা আপনার চাকরিদাতা, যাঁরা হায়ার এবং ফায়ারে বিশ্বাস করে, তাঁদের কাছে এটা পছন্দ হবে না। আমি উদাহরণ দিচ্ছি না কিন্তু আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারি। নাম ধরেও বলতে পারি কখন কী হয়েছে। আমি শুধু একটা প্রশ্ন করি সৈয়দ বদরুল আহসান সম্পর্কে। তাঁর মতো নিবন্ধকার, তাঁর মতো সৎ লেখক কজন আছে বাংলাদেশে?

এ প্রশ্নের উত্তর যদি খুঁজি তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, অনেক প্রশ্ন দেখতে পাব যে কীভাবে মালিকের আজ্ঞাবহ হতে হয়। আমাদের দেশে সাংবাদিকতায় অনেক সাংবাদিক হয়তো এজন্য ভেতরে ভেতরে একটা কষ্টে ভোগেন যে আমাকে এভাবে কম্প্রোমাইজ করে চলতে হচ্ছে! কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে মানুষকে তো করে খেতে হবে। আমার রাষ্ট্র তো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় যে আমার দেখভাল করবে। আমার নিজের দেখভাল যখন নিজেই করতে হয়, তখন তো অনেক কিছু মেনে নিয়ে, আমার নীতির বিরুদ্ধে হলেও সেটাকে মেনে নিয়ে কাজ করতে হয় এবং এ দুঃখটা সাংবাদিকদের রয়েছে। অনেক সাংবাদিকের মধ্যে আমি এ দুঃখটা দেখেছি। তাঁরা ঠিক সেভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা এটা বহন করে চলছেন এবং সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। এর মধ্য থেকেই যতদূর সম্ভব তাঁদের মতো করে কাজটি করার চেষ্টা করছেন।

এনায়েত হোসেন: পৃথিবীজুড়ে ক্ষমতার ভারসাম্যে একটা বড়ো পরিবর্তন আমরা দেখছি। নতুন মেরুকরণ, কর্তৃত্ববাদী শাসকদের উত্থানে সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, অন্যদিকে এই ডিজিটাল বুমিংয়ের যুগে আইনের নামে সাংবাদিকদের হাত-পা বাঁধা হচ্ছে বলে একটা কথা হচ্ছে। এ বিষয়টিকে আপনি দর্শনগত জায়গা থেকে কীভাবে দেখবেন?

ড. মিজানুর রহমান: দেখুন, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এতটাই পাওয়ারফুল হয়ে গেছে এবং এটা যে এত স্বল্প সময়ে এত দ্রুততার সঙ্গে সর্বগ্রাসী হয়ে যাবে, এটা কখনো কল্পনা করিনি। এটার যেমন কল্যাণকর দিক আছে, ঠিক তেমনই একটা সাংঘাতিক রকমের বিপদ বা শঙ্কার জায়গাও রয়েছে। আমি সেদিন হার্ভার্ডের ল রিভিউ পড়ছিলাম। সেখানে একজন প্রফেসর বলেছেন, এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স–কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভবিষ্যতে নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইমোশন থাকবে। এর যদি ইমোশন থাকে, তাহলে আমাদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে! এখন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা কিছু করছে, এর কপিরাইট কার কাছে থাকবে যে তৈরি করেছে ইন্টেলিজেন্স তার,

আমরা নতুন একটা যোগাযোগে প্রবেশ করছি। এ সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই এখনো, আমরা হয়তো সবার মতো যাচ্ছি। আমাদের এখানে এমন কিছু করতে হবে যাতে মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা, সেটা যেন খর্বিত না হয়

নাকি মানুষের? নাকি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইটসেলফ উড বিকাম সাবজেক্ট অব ল?

সেই আইন এবং অধিকার, কর্তব্য-দায়িত্বের নির্ণয় হয়ে যাবে হিউজ চ্যালেঞ্জ। আমরা নতুন একটা যোগাযোগে প্রবেশ করছি। এ সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই এখনো, আমরা হয়তো সবার মতো যাচ্ছি। আমাদের এখানে এমন কিছু করতে হবে যাতে মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা, সেটা যেন খর্বিত না হয়। এই ব্যালেন্সড স্ট্রাইক করা, সেটা কিন্তু ভীষণ কঠিন একটি কাজ। আমার যেটা মনে হয়, কোনো একটা আইন করে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। It has to go through process of trial and error. আমি বাস্তবভিত্তিক রিমেডি খুঁজতে চাই।

আমি একটা আইন করলাম আর সব ভালো হয়ে গেল, আমাদের সাংবাদিকরা স্বাধীন এবং মতপ্রকাশ করতে পারবেন। তারপর দেখলাম এমন সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে, যা আমি কন্ট্রোলই করতে পারলাম না। সেটা বিপর্যয় ডেকে আনল। বলার মতো যে জায়গাটি, মনে করুন দুর্গাপূজা সামনে। এই দুর্গাপূজা সামনে রেখে যদি আমি এমন কোনো সাংবাদিকতা করি, যে কারণে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হলো। উদাহরণ টানি, আমি ফেসবুক ব্যবহার করি না। কিছুদিন আগে আমার ছেলের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম যে লিটন দাস নাকি বলেছে, 'যখন আমি ভালো খেলি তখন আমি বাংলাদেশের নাগরিক আর যখন আমি রান করতে পারি না তখন আমি হিন্দু।' আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। লিটন দাস সেটি বলেননি। That's not what Liton das said. এটি একটি ফেক নিউজ। এখন এই ফেক নিউজ কেউ না কেউ ছড়াচ্ছে। এ ফেক নিউজ যদি আপনি পড়েন, কী বিধ্বংসী তথ্য! যে দেশটায় আমরা মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সব মিলেমিশে যুগের পর যুগ, হাজার বছর ধরে বসবাস করছি, সেখানে হঠাৎ কথা বলে পূজার আগে উসকানি দেওয়া ভয়াবহ। এর মধ্যে ইসরাইলের যা হচ্ছে, তথাকথিত উগ্রবাদীদের ফুঁসে ওঠার জন্য ব্রিডিং গ্রাউন্ড হয়ে গেছে। একটা ছুতো পেলেই তো তারা ভেঙে পড়বে, নেমে পড়বে মাঠে। আমাদের কতটা সতর্ক হতে হবে, আপনি এগুলোকে কীভাবে বন্ধ করবেন? সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লিখতে পারবেন না? আপনি কীভাবে করলে জিনিসটা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও হরণ হবে না আবার কারও অনুভূতিতেও আঘাত হানবে না, কীভাবে আমরা এ দুটি ব্যালেন্স করতে পারি?

আর তথাকথিত The country of liberty, fraternity and equality–এর দেশ ফ্রান্স। মহান ফরাসি বিপ্লবের এই ট্রিনিটি এত বড়ো যে, যেটা নিয়ে আমরা সবাই নিজেকে আলোকিত মনে করেছি যা সারা বিশ্ব এবং মানবসমাজকে আলোকিত করেছে। তাদের মতো দেশ কী করল? প্রো-প্যালেস্টিনিয়ান কোনো র‍্যালি হতে পারবে না, নিষিদ্ধ করল। তারা র‍্যালি নিষিদ্ধ করেনি প্রো-প্যালেস্টিনিয়ান র‍্যালি নিষিদ্ধ করেছে। কেন এ বৈষম্যমূলক আচরণ? এটা কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ নয়? এটা কি আমার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ নয়?

আজ যারা বলে বাংলাদেশে মানুষের স্বাধীনতা নেই, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, খবরের কাগজের গলা টিপে ধরা হচ্ছে ড্রাকোনিয়ান ল করে, তাহলে তোমরা কী করছ? I'm not going to that judgment, its all about judge their action.

আমরা এখানে যদি আসি, একটা মিথ্যা কারণে রামু, নাসিরনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কী হয়ে গেল? আমি দেখেছি। এক বৃদ্ধা আমাকে বলেছেন, 'বাবা এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই জন্মভূমি, আমার এই মাটিটা ছেড়ে কোথায় যাব?' আমি তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বলেছি, 'মা তুমি কোথাও যাবে না। এটা তোমার মাটি, এটা তোমার দেশ। ঠিক আমার যতটা এই দেশ, তোমারও ঠিক ততটাই এই দেশ।'

এখন নির্বাচন সামনে। অনাকাঙ্ক্ষিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার এগুলো হচ্ছে মুখ্য মাধ্যম। এসব জায়গায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করে উসকে দিতে চায় কেউ কেউ।

এগুলোকে ঠিক কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? কোনো আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? মতপ্রকাশের কতটা স্বাধীনতা থাকবে এবং স্বাধীনতা আমরা কীভাবে ব্যবহার করব?

বলা হয়, 'No freedom is a license', হেরল্ড লাস্কির কথা। এর মানে, আমার যা ইচ্ছা তাই আমি করব, এটা হয় না। আমি হাত নাড়াচ্ছি। আপনার নাকের ডগার সামনে এসে আমার হাতের স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায়। কারণ, ওখানে আপনার স্বাধীনতা শুরু হচ্ছে। যেখানে আমার স্বাধীনতা শেষ, আপনার স্বাধীনতা শুরু।

এই যে লাইনটা ড্র করার, সেটা ড্র করতে হবে। একবারেই সম্ভব নাও হতে পারে, আমরা চেষ্টা করছি। এই যেমন আমেরিকা চেষ্টা করছে, ব্রিটেন চেষ্টা করছে, কানাডা চেষ্টা করছে। No single cyber act is perfect. কোনো সাইবার আইনই পারফেক্ট নয়।

অনেক দেশের সাইবার আইনের শাস্তি আমাদের যা আছে এর থেকে আরও ভয়াবহ। ওইগুলো নিয়ে তো আমাদের কেউ কথা বলে না। যেহেতু বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাই মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে, মানবাধিকারের ফসল এই রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হোক, এটা আমরা চাই না। 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার', আমি দেখেছি। শেখ ফজলুল হক মণি যখন বলছেন, 'খবরের কাগজ ব্যান করে দেওয়া উচিত মামা।' তখন বঙ্গবন্ধু রেগে উঠলেন, 'কী বলিস তুই এটা? কী ধরনের কথা বলতেছিস তুই? আমরা কি পাকিস্তান হব? খবরের কাগজ নিষিদ্ধ করতে হবে? আমি কি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছি? তাহলে পাকিস্তান আর আমাদের মাঝে তফাত কী হলো রে? কী বলিস এই সমস্ত?'

যে মানুষটা এই স্বপ্ন দেখেছেন, যে মানুষটা আমাদের এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যে মানুষটা দেশটা দিয়েছেন, সেই মানুষটার প্রতি আমাদের কি এতটুকু দায় নেই? তো সেই দায় থেকেও তো আমরা কারও স্বাধীনতা খর্ব করতে পারি না।

কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের যারা সংখ্যালঘু রয়েছেন, সেটা ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাভাষী, পেশাগত সংখ্যালঘু বা যে কোনো ধরনের সংখ্যালঘুই হোক না কেন, তাঁদের প্রত্যেকের স্বার্থকে রক্ষা করেই তো আমাদের স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। কারও স্বাধীনতা হরণ করে আমি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে আমার নিজের স্বাধীনতা ভোগ করব, সেটা তো হতে পারে না। আমাদের সাংবাদিকদেরকে স্বাধীনতার এ ব্যাখ্যাটা উপলব্ধি করতে হবে। এ ব্যাখ্যা উপলব্ধি করেই তাদেরকে বলতে হবে সাংবাদিক হিসাবে বিধিনিষেধের আওতায় কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা গ্রহণযোগ্য নয়।

এনায়েত হোসেন: আপনি যখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন, গণমাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় আপনার উদ্যোগ আমরা দেখেছি। মানবাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা আপনি কীভাবে দেখেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের আর কতটুকু সুযোগ রয়েছে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গণমাধ্যমের?

ড. মিজানুর রহমান: আমি গণমাধ্যমের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। গণমাধ্যমের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ যে, যতদিন আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বে ছিলাম, আমি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছি। আমার কাজগুলোকে তারা জনগণের মাঝে প্রচার করেছে। আমার বক্তব্য-বিবৃতি অবিরাম প্রচার করেছে। আমি বিশ্বাস করি, আমি নিজের জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য বা সরকারকে হেয় করার জন্য কিছু করিনি। সরকার আমার ওপর যে দায়িত্বটি ন্যস্ত করেছিল, সেই দায়িত্বটি সৎভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি।

সরকার আমাকে বলেছে, তুমি দেখ হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা দেওয়া হয় কি না। তুমি দেখ, অফিস-আদালতে আইনের অনুসরণ যথাযথ হচ্ছে কি না, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ঠিকমতো হচ্ছে কি না। দেখ যে, জেলখানায় কয়েদি যারা, তারা কতটুকু মানবিক ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে।

এগুলো তো আমার দায়িত্ব। আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে যখনই ত্রুটি পেয়েছি, আমি সমালোচনা করেছি। সমস্যা থেকে যেন পরিত্রাণ পেতে পারি, প্রতিকার কী হতে পারে, সেটার জন্য আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছি। অনেক সময় নির্দেশও দিয়েছি। আমি সরকারের কাছে দাবি করেছি, প্রার্থনা করেছি। এগুলো তো আমার দায়িত্বের মধ্যেই ছিল। কাউকে ছোটো করার জন্য নয়, কাউকে হেয় করার জন্য নয়, কিংবা নিজের কোনো স্বার্থে নয়। আমি শুধু আমার কাজটা করার চেষ্টা করেছি।

আমি লক্ষ করেছি, সেসময়ও কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম হয়তো আমাকে ফলাও করে প্রচার করত এই কারণে যে, আমার কথাগুলো অনেক সময় যেভাবে শাসনব্যবস্থা চলছে তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তারা মনে করেছে এই তো, মনে হয় সরকারকে একহাত দেখে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার কারও ভাবনায় হয়তো ছিল বিষয়টি চলমান শাসনব্যবস্থার পক্ষে যাচ্ছে। ফলে আমার কথাগুলো যে যেভাবে পেরেছেন, সেভাবে ব্যবহার করেছেন। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা তো আমার ছিল না।

খোদ সরকারি দলের বিভিন্ন মহল থেকে আমার সমালোচনা করা হয়েছে। একপর্যায়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি।

প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন, 'মিজান আমি কি তোমাকে কখনো কিছু বলেছি?' আমি বললাম, 'না'। তখন তিনি বললেন, 'তাহলে অন্য কে কী বলছে, সেটা নিয়ে তুমি এত বিচলিত কেন? আমি কিছু বলিনি, এর মানে তুমি যেটা করছ সেটা করে যাও।'

আমি বললাম, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আই আন্ডারস্টুড। নাও আই অ্যাম গোয়িং।' ওখান থেকে বের হয়ে এসে আমি আমার মতো কাজ করে গিয়েছি। সো দ্যাট ওয়াজ সাপোর্টিভ।

আমার মনে হয় কি জানেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কিন্তু দারুণভাবে কাজ করার, জনগণের সেবা করার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান প্রতিপালনের কাজ করার বিরাট ভূমিকা আছে। আমাদের যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক, সেটা আমার সম্পদের সীমাবদ্ধতা, আইনি সীমাবদ্ধতা, এখতিয়ারজনিত সীমাবদ্ধতা হোক, আমাদের যতটুকু আছে এর মধ্যে অনেক কিছু করা সম্ভব। আমি দেখেছি, আমার ক্ষমতা না থাকলেও আমি তৎকালীন কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে যখনই কোনো নির্দেশ দিয়েছি, সেটি প্রতিপালিত হয়েছে। নট বিকজ দে আর আন্ডার মাই কমান্ড, বাট বিকজ দে থট–এটা করা দরকার। কেননা এটা না করলে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হবে এবং বিষয়টা সেনসিটিভ। সো বেটার যে এটা আমরা করি।

কেউ যদি তার যথাযথ কাজটা না করে, সেটা তার ব্যাপার। যদি মনে করে কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকাটাই তার জন্য নিরাপদ, সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু আমি তো তখন র‍্যাব, পুলিশ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেও কখনো কোনো বিপদের সম্মুখীন হইনি।

হ্যাঁ, আমার প্রতি থ্রেট এসেছে কয়েকটা; কিন্তু ওই থ্রেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা আমাকে কখনো টলাতে পারেনি। তাই আমি বিশ্বাস করি, দেয়ার ইজ এ হিউজ স্কোপ টু ডু, হিউজ স্কোপ টু ওয়ার্ক ফর হিউম্যান বিংস।

গণমাধ্যমেরও এই সুযোগটা আছে এবং আমার মনে হয় গণমাধ্যম যদি সত্যিকার অর্থে জনগণের স্বার্থে, মানবাধিকারের স্বার্থে, সংবাদ প্রচার করে এবং কোনো রকমের বিকৃতি বা অসত্য তথ্য যদি প্রচার না করে, ভয়ের কিছু নেই এবং সেটাকে কখনো চ্যালেঞ্জ করারও সুযোগ নেই।

এটা করা যায় এবং আমার মনে হয়, সাংবাদিকতায় যাঁরা জড়িত, তাঁদেরও কর্তব্য সুশাসনের জন্য যেখানে যে দুর্বলতা, সে দুর্বল জায়গাগুলো শনাক্ত করা, ধরিয়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, এটার তো প্রয়োজন আছে।

এনায়েত হোসেন: সারা পৃথিবীর মতোই আমাদের এখানেও সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষার জায়গায় দুর্বলতা নিয়ে কথা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত।

ড. মিজানুর রহমান: দেখুন, আপনার হয়তো মন খারাপ হতে পারে তবুও বলছি, সাংবাদিকদের বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে কিংবা বিশেষ নিরাপত্তা কাঠামোর প্রয়োজন আছে, এ ব্যাপারে আমি একটু ভিন্নমত পোষণ করি। আমার কথা হচ্ছে, প্রত্যেক নাগরিকের যে আইনি সুরক্ষা প্রাপ্য, সেই সুরক্ষা সাংবাদিকেরও থাকতে হবে। আমরা যদি প্রত্যেক নাগরিককে যথাযথ এবং প্রকৃত আইনি সুরক্ষা দিই, তাহলে সাংবাদিকরা সেখান থেকে বাদ যাবে না।

তবে সাংবাদিকদের যে বিশেষ পেশা এবং যখন সাংবাদিকের সুরক্ষার প্রশ্ন আসে, তখন প্রতিটি কেইসের ক্ষেত্রেই বিচারক, আদালত এবং আইন এই বিশেষ পেশা ও অবস্থাকে বিবেচনায় রাখে। এটা সব সময় হয়ে থাকে।

আমাদের দরকার এটা নিশ্চিত করা যে, প্রত্যেক মানুষই সম-অধিকারসম্পন্ন এবং সংবিধান অনুযায়ী আইনের সমান সুযোগের অধিকারী আর এটা যদি নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে সাংবাদিকদের দুর্ভাবনার কোনো স্থান থাকবে না।

এনায়েত হোসেন: আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. মিজানুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ। নিরীক্ষা'র পাঠকদের শুভেচ্ছা।

বাক্‌স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতা মানবাধিকার প্রেক্ষিত

■ ড. শাহজাহান মন্ডল

বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার তথা মুক্তভাবে কথা বলার অধিকার হলো বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত ২৭টি মানবাধিকারের একটি। এর মধ্যে ২৩টি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে স্বীকৃত। ৬টি দ্বিতীয়ভাগে সমাজতান্ত্রিক বা নীতি-অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। যেমন: অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও সংস্কৃতির অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫ক, ২৩ ও ২৩ক)। বাকিগুলো স্বীকৃত তৃতীয়ভাগে পুঁজিবাদী বা মৌলিক অধিকার হিসাবে। যেমন: আইনের দৃষ্টিতে সমতা পাওয়ার অধিকার, বৈষম্যের শিকার না হওয়ার, আইনের আশ্রয় লাভের, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার, আন্দোলন-সমাবেশ-সংগঠনের স্বাধীনতা লাভের, ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের, হাইকোর্টে রিট মামলা করার অধিকার প্রভৃতি (অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১ ও ৪৪)। নাগরিকের বাক-ভাব প্রকাশের এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অধিকার ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত। জাতিসংঘ প্রণীত ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার Universal Declaration of Human Rights (UDHR) অনুচ্ছেদ ১৯-এ এটি মানবাধিকার হিসাবে ঘোষিত ও স্বীকৃত এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯-এ 'মৌলিক অধিকার' হিসাবে গ্যারান্টিপ্রাপ্ত। এটি লঙ্ঘিত হলে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করে প্রতিকার পাওয়া যায়। গণতন্ত্র বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ মানবাধিকারটি বাংলাদেশ পার্লামেন্টে ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুমোদিত (ratified) 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬'-এর ১৯ অনুচ্ছেদেও গ্যারান্টিপ্রাপ্ত। ইংরেজিতে চুক্তিটির নাম International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)। বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার

অধিকারটি মানবাধিকার দলিলগুলো থেকে সংগৃহীত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় বাহাত্তরের সংবিধানে এমন মর্যাদাপূর্ণ স্থান পেয়েছে। এ অধিকারের বলে বলীয়ান হয়ে আমাদের দেশের কোনো নাগরিক যেমন ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে পারে, তেমনই সংবাদক্ষেত্র তথা প্রিন্ট ও সফট গণমাধ্যমগুলো (ছাপানো পত্রিকা, টিভি, ইউটিউব, অনলাইন পত্রিকা প্রভৃতি) নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে সংবাদ ও তথ্য ছাপানো, পরিবেশন ও প্রচার করতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার সময় মিডিয়া বা গণমাধ্যমের সংখ্যা ছিল ৪৫০। মত, সংবাদ ও তথ্য প্রচার বিষয়ে বর্তমান সরকারের উদারনীতির কারণে বর্তমানে ২০২৩ সালে এ সংখ্যা ১,২৬০। তবে মনে রাখা ভালো, পৃথিবীতে কোনো অধিকার-বাক্‌স্বাধীনতাই সীমানাবিহীন নয়। হওয়া উচিতও নয়। সীমাবদ্ধতা না থাকলে কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা আনন্দময় হয় না, হয় না যথার্থ। ক্ষুধা না থাকলে খাওয়ায় কোনো আনন্দ হয় না, অর্থও হয় না। বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারচর্চা করতে গিয়ে কোনো নাগরিক অন্যকে গালি দেওয়ার এখতিয়ার রাখে না। তেমনই কোনো গণমাধ্যম সবকিছু লেখার বা বলার এখতিয়ার রাখে না। অসত্য, ভিত্তিহীন ও ভুল তথ্যনির্ভর কোনো সংবাদ বানানোর বা পরিবেশনের তথা হলুদ বা কালো সাংবাদিকতা করার এখতিয়ার রাখে না। এমনকি সত্য তথ্য হলেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নস্যাৎ করার মানসে তা ছাপাতে, পরিবেশন করতে বা প্রচার করতে পারে না। আইন তাকে অ্যালাউ করে না। উল্লিখিত সংবিধান, সর্বজনীন ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ কিছু আইন এ অধিকারের সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছে। যেমন: ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ১২৪ক ও ৪৯৯-৫০৫ ধারা, ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারা, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা, ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ৩ক ধারা, ১৯৭৩ সালের দ্য প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্টের ২০ ধারা, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ ও ৩ ধারা, ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের ১২ ধারা, ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা, ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৪ ধারা, ২০১৩ সালের আদালত অবমাননা আইনের ৪ ধারা প্রভৃতি।

ব্যক্তির বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অধিকারের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ শুধু বাংলাদেশের চিত্র নয়, পৃথিবীর সব দেশের চিত্র। সব সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক ও গণমাধ্যম এ অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে এরূপ সীমাবদ্ধতার অধীন। চীন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশে তো এ অধিকারের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা দুঃসাধ্য। তবে বাংলাদেশে সহজ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এ ব্যবস্থা করেছিলেন ১৯৭২ সালে। তবে তা ওই সীমানা সাপেক্ষে। সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সীমানাগুলোর কথা বলা হয়েছে এভাবে–'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।' এর অর্থ হলো, বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বা গণমাধ্যম অধিকারটি চর্চা করতে চাইলে তাকে ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৮টি সীমানা মানতে হবে, যথা: সে তা করতে গিয়ে অবশ্যই (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারবে না, (২) কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করার প্রয়াস পাবে না, (৩) জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারবে না, (৪) কারও শালীনতা নষ্ট করতে পারবে না, (৫) বাংলাদেশি সমাজে বিদ্যমান নৈতিকতা নষ্ট করতে পারবে না, (৬) আদালত অবমাননা করতে পারবে না, (৭) কারও মানহানি করতে পারবে না এবং (৮) অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিতে পারবে না। যদি সে এগুলো করে, তাহলে তার দ্বারাই বরং সংবিধান লঙ্ঘিত হয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধেই তখন আদালতে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া যায়।

এ মানবাধিকারটির আরেকটি স্বরূপ আছে, তা বলা আছে উপর্যুক্ত UDHR-নামক জাতিসংঘ ঘোষণায় এবং ICCPR-নামক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে। উভয়ের অনুচ্ছেদ ১৯-এ বর্ণিত স্বরূপটি হলো, গণমাধ্যম মারফত তথ্য ও চিন্তা তল্লাশ, গ্রহণ ও প্রদান (seek, receive and impart)–এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। চুক্তিটি একধাপ এগিয়ে এও বলে যে, তথ্য ও চিন্তাগুলো মৌখিক, লিখিত ও ছাপানো হতে পারে আবার শিল্পের মাধ্যমেও হতে পারে। খুব সতর্কভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, এ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে কোনো ব্যক্তিকে কোনো মত তৈরি ও প্রকাশের অধিকার দেওয়া হয়েছে, কোনো অপমত তৈরি ও প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। একইভাবে অপতথ্য ও অপচিন্তা (wrong information and faultyidea) তল্লাশ, গ্রহণ ও প্রদানের কথা বলা হয়নি। মত, তথ্য ও চিন্তা তখনই অপমত, অপতথ্য ও অপচিন্তায় পরিণত হয়, যখন তা উল্লিখিত ৮টি সীমানার যে কোনোটি লঙ্ঘন করে। সহজ ভাষায় বলতে হয়, যখন কোনো ব্যক্তি বা সংবাদক্ষেত্র কোনো অপমত তৈরি ও প্রকাশ করে কিংবা হলুদ বা কালো সাংবাদিকতা করে, তখন তা বরং অন্য ব্যক্তির সঠিক তথ্য ও চিন্তা তল্লাশ, গ্রহণ ও প্রদানের মানবাধিকার খর্ব করে। তখন ওই অন্য ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার হকদার হয়ে যান।

গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি বিজ্ঞাপন ছাপেন। এতে তারা বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানান নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে হয়রানি না করার জন্য। এটি কোনো সংবাদ ছিল না, বিজ্ঞাপনমাত্র। যে কোনো পত্রিকা টাকা পেলে বিজ্ঞাপন ছাপে। ভালো অঙ্কের টাকা না ঢাললে ওয়াশিংটন পোস্টের মতো বিশ্বখ্যাত পত্রিকায় এরকম বিজ্ঞাপন ছাপানো যায় না। আমাদের দেশের দৈনিক জনকণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ডেইলি সান, দৈনিক বাংলা প্রভৃতি পত্রিকা কিংবা সময় টিভি, একাত্তর টিভি প্রভৃতি চ্যানেল কোটি টাকা পেলেও এমন বিজ্ঞাপন ছাপবে বা প্রচার করবে কি না সন্দেহ। কারণ, ড. ইউনূসকে মিথ্যা কোনো মামলায় এখন পর্যন্ত জর্জরিত করা হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। তিনি গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিকদের বিশাল অঙ্কের লভ্যাংশ প্রদান করেননি বিধায় বঞ্চিত শ্রমিকরা মামলা করেছেন, এটি কোনো হয়রানির ব্যাপার হতে পারে না। এরকম মামলা করাটা তাদের সাংবিধানিক মৌলিক মানবাধিকার, যা গ্যারান্টিপ্রাপ্ত হয়েছে সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে। কেউ অপরাধ করলে তা নিয়ে আদালতে মামলা হলে সে বিষয়ে গণমাধ্যমগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে লিখতে পারে, তা আইন বা সংবিধানে উল্লিখিত সীমানা অতিক্রম করে না।

বস্তুনিষ্ঠতা শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মিডিয়া কেন, সব মিডিয়ার ব্রত হওয়া উচিত। তবে দুঃখের ও শঙ্কার কথা হলো–এখনো দেশে নিরপেক্ষতার স্লোগানধারী কিছু ব্যক্তি ও গণমাধ্যম আছে, যারা অসত্য-ভিত্তিহীন এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কথা বলতে, ছাপতে ও প্রচার করতে পছন্দ করে। উল্লিখিত ওই সীমানার কথা এরা বেমালুম ভুলে যায়। গণমাধ্যমগুলোর রিপোর্ট-লেখনীর মনোগতি দেখলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সরকারের নজরেও বোধহয় অনেক সময় এগুলো পড়ে না। 'গ্লাসে অর্ধেক পানি' বিষয়টিকে একজন যদি বলে 'গ্লাসটি

একটি বিশেষ ব্যক্তিমহল ও গণমাধ্যমমহল ২০০৭-এ সেনানির্ভর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে কারাবন্দি রাখার উদ্দেশ্যে এবং রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকাবস্থায় 'নাগরিক শক্তি' নামক নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে কী ভূমিকা পালন করেছে, দেশে আমেরিকার ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ করে দেওয়ার মানসে কী কী বিষয় ছেপেছে

অর্ধেক ভর্তি' তবে তাকে পজেটিভ মনোগতির লোক বলা যায়। কিন্তু যদি সে বলে 'গ্লাসটি অর্ধেক খালি' তবে তাকে নেগেটিভ মনোগতির লোক বলা যায় নিঃসন্দেহে। এখানে নিরপেক্ষ দুজনই; কিন্তু কার (মনোগতি বা motive) কোনদিকে, তা স্পষ্ট হয় বৈকি। গণমাধ্যমের মনোগতিও এরকম হতে পারে। বেশকিছু সংবাদমাধ্যম আছে, যারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমনভাবে কোনো ঘটনার উপস্থাপনা করে, যাতে সত্যতার পরিমাণ কম থাকে, অনেক সময় থাকে না। কিন্তু কম থাকলে মানুষ তা পড়ে কম, পত্রিকা বিক্রি হয় কম বিধায় উপার্জন হয় কম। তাই উপার্জন বৃদ্ধির আশায় রংচং লাগিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এরকম হলুদ সংবাদক্ষেত্র তৈরি করা সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। ১৮৮৩ সালে জোসেফ পুলিৎজারের পত্রিকা নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ও উইলিয়াম হিয়ার্টজের পত্রিকা নিউইয়র্ক জার্নাল অসৎ ও অসত্য সংবাদ ছাপানোর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জনে ব্রতী হয়। পুলিৎজারের পত্রিকায় কার্টুনিস্ট রিচার্ড ফেন্টো আউটকল্ট 'হোগানস অ্যালি' নামে কমিক স্ট্রিপ আঁকতেন, যার মুখ্য চরিত্র হিসাবে থাকত হলুদ বর্ণের এক শিশু। হিয়ার্টজের পত্রিকাও তাই করে। উভয় পত্রিকা চটকদার গালগপ্পো ও মিথ্যা সংবাদ বিক্রিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে পড়ে। নেতিবাচক সংবাদ লুফে নিতে পাঠককুলও উৎসুক হয়। পত্রিকাগুলোর আয় বেড়ে যায়। তখন থেকে 'হলুদ সাংবাদিকতা' নামক কর্ম শুরু। একপর্যায়ে কিউবার হাভানায় আমেরিকার জাহাজডুবির জন্য নির্দোষ স্পেনের ওপর মিথ্যা দায় চাপায় ওই দুই পত্রিকা। যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রাণ যায় সৈনিকদের আর হাজারো বেসামরিক মানুষের। পত্রিকা দুটোর বিক্রি যায় বহুগুণ বেড়ে। হলুদ সাংবাদিকতা প্রাণ কেড়ে নেয় বহু মানুষের। এ জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে না কোনো গণমাধ্যম। কারণ, তা মানবাধিকার নয়, সাংবিধানিক অধিকার নয়, আইনগত অধিকারও নয়, বরং এর লঙ্ঘন।

এখন সবার হাতে মোবাইল ফোন-ইন্টারনেট-গুগল-তথ্যভান্ডার। সবাই বুঝতে পারে, একটি বিশেষ ব্যক্তিমহল ও গণমাধ্যমমহল ২০০৭-এ সেনানির্ভর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে কারাবন্দি রাখার উদ্দেশ্যে এবং রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকাবস্থায় 'নাগরিক শক্তি' নামক নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে কী ভূমিকা পালন করেছে, দেশে আমেরিকার ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ করে দেওয়ার মানসে কী কী বিষয় ছেপেছে, প্রচার করেছে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে কীভাবে হুমকির মুখে ফেলেছে। ওই বিশেষ মহল পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত অর্থ আটকানোর উদ্দেশ্যে কি না করেছে, তাও জনগণ বোঝে। বিশ্বব্যাংক ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কানাডার এসএনসি-লাভালিন কোম্পানি সেতু নির্মাণের কাজ পাওয়ার আশায় একজন বাংলাদেশি কর্মকর্তাকে ঘুস দিয়েছিল–এমন অজুহাত দেখিয়ে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাতিল করে। বিশ্বব্যাংকের চাপে এডিবি ও জাইকাও অর্থ সহায়তা বন্ধ করে। ২০১৭ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্লামেন্টে তাঁর ভাষণে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রত্যাহারে ভূমিকা রাখেন। কানাডার আদালতে এসএনসি-লাভালিন অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলার বাদীর ভিত্তি ছিল দুটি–টেলিফোনে আড়ি পাতা কথা এবং রমেশ সাহা নামক কোম্পানির এক অফিসারের ডায়ারি, যাতে লেখা ছিল কয়েকজন বাংলাদেশি মিলে ১০-১২ শতাংশ কমিশন পেতে যাচ্ছে। আদালত ২০১৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আড়ি পাতা কথা ও ডায়ারি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী এগুলো সাক্ষ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। বিচারপতি ইয়ান নরধেইমার (Ian Nordheimar) আড়ি পাতার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে ধারণা, গল্প ও রটনার বেশি কিছু মনে করেননি। আদালত মামলাটি কৌশলগত কারণে (technicality) খারিজ করেন এবং অফিসারদের বেকসুর খালাস দেন। বিশ্বব্যাংকের চাপে বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমেও তদন্ত করে। ৫৩ দিনের তদন্তে দুর্নীতির কিছুই পাওয়া যায়নি। ফলে ঢাকা জেলা জজকোর্ট দুর্নীতি ষড়যন্ত্র মামলায় সাতজন অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাকে বেকসুর খালাস দেন। কল্পিত দুর্নীতির অজুহাতে যখন বিশ্বব্যাংক ঋণ দেওয়া বন্ধ করে, তখন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের মান-মর্যাদা চরম প্রশ্নের মুখে পড়ে। অপরদিকে উল্লসিত হয়ে মনোগতি বা ভাব প্রকাশ করে ওই বিশেষ ব্যক্তিমহল ও গণমাধ্যমমহল। কল্পিত অভিযুক্ত মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, দেশের নিজস্ব অর্থ দিয়েই পদ্মা সেতু বানাব। আজ প্রমত্ত পদ্মার বুকে বাঙালির পদ্মা সেতু দৃশ্যমান। প্রয়োজনীয় কথা হলো, ওই সময় পদ্মা সেতু বিষয়ে দেশের জনগণের কাছে এবং বিশ্বব্যাংক ও বিশ্বনেতারাসহ নানান ফোরামের কাছে যেসব ব্যক্তি বা গণমাধ্যম বিভি-ন্ন কথা-চিহ্ন-প্রতীক বা অন্য কিছু দ্বারা বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত ও আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টি করে আনন্দ পেতে চায়, তারা বাংলাদেশে কার্যকর ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা মোতাবেক 'রাষ্ট্রদ্রোহ' নামক অপরাধ করে। এতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে, কিছু রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯(২)-এ বর্ণিত বিধান লঙ্ঘিত হয়। এক্ষেত্রে হলুদ বা কালো সাংবাদিকতা হয়েছে কি না, জনগণ সহজেই আঁচ করতে পারে। পরিশেষে প্রত্যাশা, উল্লিখিত দেশীয় আইন, সংবিধান ও আন্তর্জাতিক আইনি দলিলগুলো চিন্তায় রেখে কোনো ব্যক্তি বা সংবাদক্ষেত্র মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করলে তাদেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল।

লেখক: অধ্যাপক; সাবেক চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ; সাবেক ডিন, আইন অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এবং কেন্দ্রীয় আইনবিষয়ক সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশ

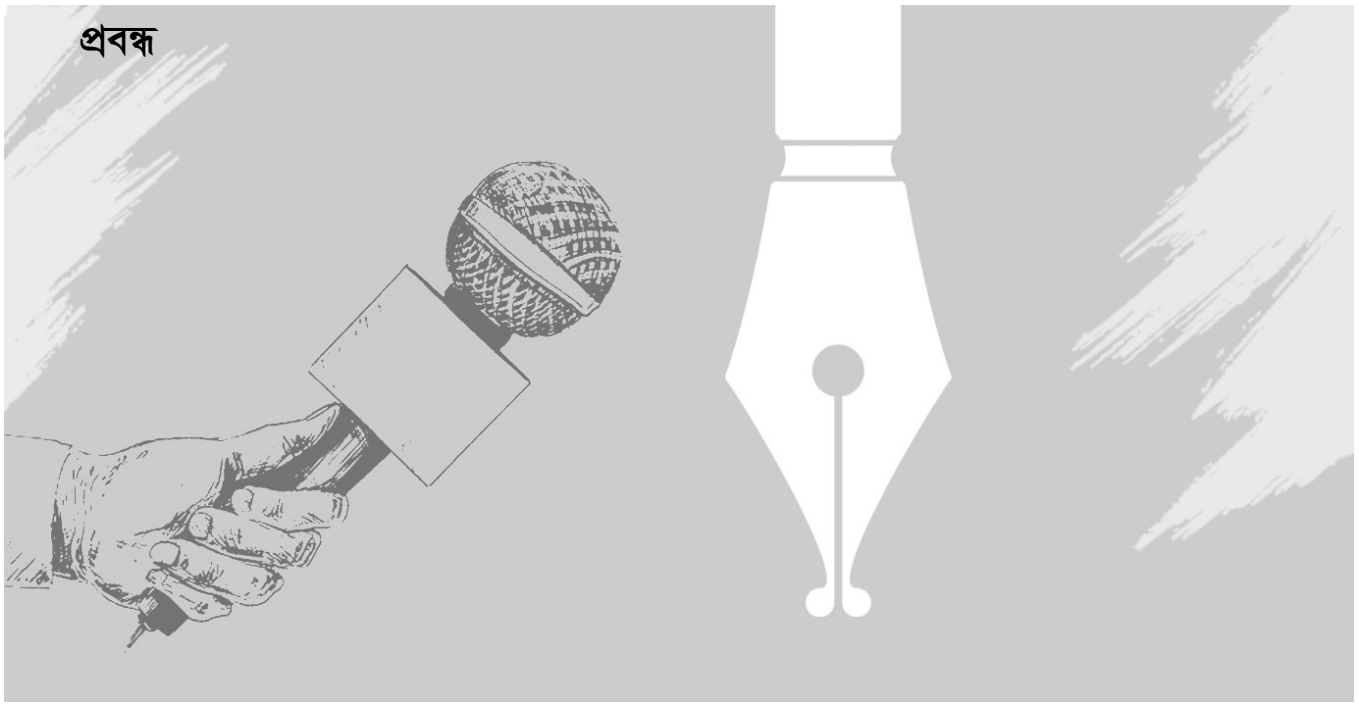

সাংবাদিকতায় চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ

■ প্রফেসর ড. রেবা মন্ডল

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of thought and conscience) মানুষের জন্মগত অধিকার, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা। চিন্তা করা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। আর অন্তর নিঃসৃত চেতনা, যা সুবিবেচনাকে নির্দেশ করে, তাই হলো বিবেক। তবে চিন্তা ও বিবেক বা চেতনা–এ দুটি বিষয়ই মানুষের মনোজাগতিক ঘটনা প্রবাহের ফল, যা প্রকৃতিপ্রসূত বা ঈশ্বরপ্রদত্ত কোনো বিষয়। মানুষের মানসিক অবস্থা, মনন-দর্শন তার পরিবেশ কিংবা প্রতিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোনো মানুষের মানসিক বিকারগ্রস্ততা, পাগলামি অনেক ক্ষেত্রে নিছক মস্তিষ্কজনিত রোগ আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের ফলে সৃষ্ট মানসিক রোগ। সুস্থ কল্পনাশক্তি সুস্থ মন ও সুস্থ পরিবেশ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার একজন মানুষের মানসিক সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার সুস্থ কল্পনাশক্তি থেকে। কল্পনা (Imagination) ও চিন্তা (Thought) সমার্থক হলেও কল্পনা অলীক ও বাস্তববাদী হতে পারে আবার চিন্তাভাবনায় বিচারবিবেচনা ও বাস্তবসম্মত কল্পনা থাকতে পারে। চিন্তা বা কল্পনা অবাস্তব বা বাস্তবসম্মত হোক, তা মানুষের মস্তিষ্কজনিত ক্রিয়াকর্মের ফল। আর যখনই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তখন সেটি পরিবেশের ওপর কোনো না কোনো প্রভাব ফেলে। অনেক সময় চিন্তা ও ভাবপ্রকাশে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে বড়ো লেখক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক,

বিজ্ঞানী হয়ে পৃথিবী ও তার সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। আবার কখনো মত ও তার প্রকাশের ফলে মানবতা তথা মানবসভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি সাংবিধানিক অধিকার, মানবাধিকার–এটি যেমন সত্য, তেমনই মতপ্রকাশ করে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, দেশ, জাতি ও তার উন্নয়নকে বিপর্যস্ত করা, বাধাগ্রস্ত করা নিশ্চয়ই কোনো অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অন্য কথায়–এমন কোনো মত প্রকাশ করা যায় না, বক্তব্য পেশ করা যায় না; যা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিপন্থি। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে আইনকানুন প্রণীত হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশের মহান সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩৯(১)-এর মাধ্যমে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতাকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, যা লঙ্ঘন করলে অনুচ্ছেদ ১০২-এর অধীনে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন (writ petition) দায়ের করতে পারেন এবং পেতে পারেন প্রতিকার। আবার অনুচ্ছেদ ৩৯(২)-এ বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।' মূলত অনুচ্ছেদ ৩৯(২)-এ মানুষের 'বাক্য' সংযম হয় যাতে সেরকম বিধান রাখা হয়েছে এবং মানুষ যাতে গঠনমূলক কথা-বক্তব্য-বিবৃতি-আলোচনা-সমালোচনা করে সে বিষয়কে সমুন্নত করেছে। উল্লেখ্য, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার ভোগ করার নামই স্বাধীনতা। আর্নেস্ট বার্কারের মতে, 'প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সবার স্বাধীনতা প্রয়োজনের দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।' সুতরাং, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মনঃসংযম ও বাক্য সংযমের আওতাভুক্ত। ব্যক্তিস্বাধীনতা, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে জনকল্যাণে ব্যবহৃত হওয়াই আইনানুগ ও বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯(২) (ক) ও (খ)-এর অধীনে নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে। উল্লেখ্য, আমেরিকার পত্রিকা 'The Washington Post'-এ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বিচারবহির্ভূত রাখার উদ্দেশ্যে ১০৭ জন নোবেল লরিয়েটের বিবৃতির প্রচার সভ্য জাতির প্রত্যাশাকে খর্ব করে। একইভাবে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচারপ্রার্থী ভুক্তভোগী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মানবীয় দাবিকে ক্ষুণ্ন করে; যা সাংবাদিকতার মহৎ উদ্দেশ্য 'সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করাকে' ব্যাহত করে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে। গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, শ্রমিকদের ৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দেওয়ার কথা ছিল, যার মূল্য ৫০০ কোটি টাকা। জালিয়াতির মাধ্যমে ঘুস দিয়ে ওই সংখ্যাটি ৪০০ কোটি টাকায় নামিয়েছেন, সেটিও তিনি দেননি। এহেন বেশকিছু অপরাধ করেছেন, রাষ্ট্রীয় আইন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ১২৩(১) লঙ্ঘন করেছেন নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূস। আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীরা যদি ন্যায়বিচার পাওয়ার স্বার্থে মামলা করেন, তাহলে তা হয়রানি বলে বিবেচিত হতে পারে না। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭-এ বলা হয়েছে, 'All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law.' ফিয়ডর ডস্তয়েভস্কির 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাস থেকেও প্রতীয়মান হয়, প্রকৃত অপরাধী শাস্তি পাবে। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ জুরিস্ট ও আইন গ্রন্থপ্রণেতা লর্ড ডেনিং ডা. থমাস ফুলারের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, 'তুমি যত বড়োই হও না কেন, আইন তোমার চেয়ে বড়ো।' আন্তর্জাতিক আইনবিদ জে জি স্টার্ক বলেছেন, সভ্য জাতিগুলোর প্রত্যাশা হচ্ছে–কোনো অপরাধীকে শাস্তিবিহীন যেতে দেওয়া যায় না। অপরাধীর বিচারদণ্ড; অন্যদিকে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য মহৎ ও কল্যাণকর। প্রকৃতপক্ষে চিন্তা, বিবেকের স্বাধীনতা দ্বারা মহৎ প্রপঞ্চ বৈ অন্য কিছু নির্দেশিত হয় না। 'Benjamin Franklin' বলেছেন, 'Without freedom of thought, there can be no such thing as wisdom and no such thing as public liberty without freedom of speech.' মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। যেমন: UDHR (Universal Declaration of Human Rights)-এর অনুচ্ছেদ ১৮ ও ১৯। অনুচ্ছেদ ১৮তে বলা হয়েছে: 'Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion.' আবার ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'Everyone has the right to freedom of opinion and expression.' এখানে, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)-এর অনুচ্ছেদ ১৮ ও ১৯ প্রণিধানযোগ্য। মানবাধিকারের সর্বজনীন দলিলের মতোই ICCPR-এর অনুচ্ছেদ ১৮: 'Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion.' এবং অনুচ্ছেদ ১৯ (ICCPR)-এ বলা হয়েছে: 'Everyone shall have the right to hold opinions without interference.' বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই এসব আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষর করেছে। অর্থাৎ, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ দেশে UDHR-এর বর্ণিত বিধানগুলো সভ্যতা ও সৌজন্যের খাতিরে মেনে চলে থাকে এবং ICCPR একটি চুক্তি বিধায় এর বর্ণিত বিধানগুলো মেনে চলতে বাধ্য থাকে এ চুক্তির ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। আর UDHR-এর প্রস্তাবনার প্রথম প্যারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় চিন্তা-বিবেক-ধারণা-বক্তব্যের স্বাধীনতাকে, যা একজন ব্যক্তিমানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশের স্বাধীনতাও বটে–যা মানুষ ও তার সভ্যতার জন্য সত্য, সুন্দর ও শান্তিময়। কিন্তু কখনোই কোনো স্বাধীনতা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে, মানবসভ্যতা ও শান্তিময় বিশ্ব পরিবেশের পরিপন্থি হতে পারে না। আমাদের স্মরণ করতে হয়, ভাবতে হয়, প্রত্যাশা করতে হয় UDHR-এর প্রস্তাবনার প্রথম প্যারাটিকে, 'মানব পরিবারের সব সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং সম্মান ও অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারগুলোর স্বীকৃতি হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও পৃথিবীময় শান্তির ভিত্তি।'

আসলে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের অন্যতম বাহন হলো সাংবাদিকতা। Truth, Accuracy এবং Objectivity হলো সাংবাদিকতার প্রধান তিনটি স্তম্ভ। একটি দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যম একটি সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। সত্য, স্বচ্ছ ও গঠনমূলক সাংবাদিকতা সভ্য দুনিয়াকে আরও সুসভ্যরূপে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সত্যের জয় অনিবার্য। সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা, যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তথা গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও বিকাশে অপরিহার্য। কিন্তু অসভ্য, অস্বচ্ছ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য পরিবেশনা সাংবাদিকতার পেশাকে যেমন কলুষিত করে, তেমনই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর উন্নয়নের গতিরোধ করে; যা বিশ্বব্যাপী অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, অস্বীকৃত এবং আইন ও নৈতিকতা পরিপন্থি।

লেখক: সাবেক ডিন, আইন অনুষদ, ইবি, কুষ্টিয়া

আদালত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতারও বড়ো খনি

■ জুলফিকার আলি মাণিক

সাংবাদিকতায় খবরের একটি বড়ো খনি আদালত। বিগত ৩৩ বছরের সাংবাদিকতায় আরও অনেক বিষয়ের পাশাপাশি আইন-আদালত নিয়েও নিয়মিত রিপোর্টিং করেছি অন্তত দুই যুগ। দেশজুড়ে পরিচিত আদালতব্যবস্থা ছাড়াও সাধারণের অপরিচিত সামরিক, আধা-সামরিক আদালত নিয়েও সাংবাদিকতা করেছি। আদালতকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা 'কোর্ট রিপোর্টিং' নামে পরিচিত, যা নিয়ে সাধারণভাবে সাংবাদিকদের মধ্যে ভীতি কাজ করে। এই ভীতি প্রতিবেদক থেকে প্রধান প্রতিবেদক, ডেস্কের সহ-সম্পাদক থেকে বার্তা সম্পাদক, এমনকি বহু সম্পাদক ও গণমাধ্যমের মালিকদের মধ্যেও দেখেছি। ভয়টা মূলত আদালত অবমাননার মামলা নিয়ে। পুরোনো প্রচলিত একটি কথা–'আদালতের হাত অনেক লম্বা'। সাংবাদিকদের দুশ্চিন্তার জায়গাটি হলো–আদালতবিষয়ক সত্য প্রতিবেদন করলেও আদালত অর্থাৎ বিচারক যদি নাখোশ বা অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তাদের 'লম্বা হাত' দিয়ে আদালত অবমাননার মামলা ঠুকে দিতে পারেন। তাই কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আদালতকেন্দ্রিক রিপোর্টিং নিয়ে সাধারণভাবে সাংবাদিকদের মন ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। অর্থাৎ, আদালত অবমাননার মামলা 'জুজুর ভয়'-এর মতো কাজ করে। প্রায় দেড় দশক আগে হাইকোর্টের একজন বিচারকের জাল-জালিয়াতি করা এলএলবি সনদ নিয়ে কিছু পত্রিকা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করলে সেই সাংবাদিকরা

আদালত অবমাননা মামলার শিকার হন। শিকার শব্দটা এজন্য বলছি, রিপোর্টগুলো ছিল প্রমাণিত সত্যনির্ভর। তবু আদালত ও বিচারকের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে আদালত অবমাননার মামলা করা হয়েছিল সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। এমন বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় সাংবাদিকদের মনে ভীতি তৈরি হয়েছে। এ ধরনের ভীতি থেকে দেশের সংবাদপত্রগুলো একসময় কোর্ট রিপোর্টিং করার জন্য সাংবাদিকের পরিবর্তে আদালতের আইনজীবী নিয়োগ দিত। অবশ্য বিগত দুই দশকে সেই চর্চা অনেকটাই বিলুপ্ত। আদালত নিয়ে এখন পেশাদার সাংবাদিকরাই বেশি রিপোর্টিং করেন। তবে অল্পসংখ্যক আইনজীবী সাংবাদিকতা করার দারুণ দক্ষতা অর্জন করায় আইনের চর্চার পাশাপাশি আজও সাংবাদিকতার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

হোক ছোটো, মাঝারি কিংবা বড়ো–প্রতিদিনই রিপোর্ট হওয়ার মতো কিছু না কিছু ঘটনা আদালতে ঘটে। নিয়মিত এসব প্রতিবেদনের বাইরেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার দারুণ একটি ক্ষেত্র আদালত বা আদালতকেন্দ্রিক কার্যক্রম। কারণ, আদালতকে ঘিরে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার বহু উপাদান থাকে। সমাজের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত সব স্তরের মানুষ জীবনের সব ধরনের সমস্যার বিচারিক সমাধান খুঁজতে আইন-আদালতের শরণাপন্ন হন। ফলে কোর্ট রিপোর্টিং সমাজের বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে জানা ও বোঝার দারুণ সুযোগ করে দেয় সাংবাদিককে। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে একজন সাংবাদিক যে কোনো ঘটনা, বিষয় বা ইস্যু সম্পর্কে আরও গভীরে অনুসন্ধান চালাতে পারেন, আবিষ্কার ও উন্মোচন করতে পারেন বহু ঘটনার অজানা পূর্ণাঙ্গ চিত্র, যা আদালতের বিচার দিয়ে উঠে আসে না। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনার স্বার্থে নিজের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করছি।

দেশের রাজনীতির ইতিহাসে ঘৃণ্যতম সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট। সামরিক অস্ত্র গ্রেনেড দিয়ে সেসময় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) দলের শীর্ষ নেতাদেরসহ হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। সন্ত্রাসী হামলাটি হয়েছিল শেখ হাসিনার সন্ত্রাসবিরোধী জনসমাবেশে। '২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা' হিসাবে পরিচিত এই ভয়ংকর রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে সেদিন শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর দলের বিভিন্ন স্তরের অনেক নেতাকর্মী নিহত হন এবং গ্রেনেডের স্প্লিন্টারে আহত হন সাংবাদিকসহ সমাবেশের শত শত মানুষ। আমি তখন ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি স্টার' পত্রিকার রিপোর্টার। ঘটনাস্থলে সরেজমিন ভয়াবহতা দেখে সেদিন এ বর্বরতম সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবেদন করি। এরপর থেকে নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর এ গ্রেনেড হমালা নিয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন লিখেছি। সেই দীর্ঘ কাজের ধারাবাহিকতায় নিজের চোখে সন্ত্রাসী হামলায় ব্যবহৃত গ্রেনেড গভীর রাতে সেনাদল দিয়ে নষ্ট করতে দেখেছি। অথচ সেগুলো মামলা ও বিচারের অন্যতম প্রধান আলামত ছিল। সেই সন্ত্রাসী হামলার তদন্ত ও বিচারকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার অপচেষ্টা করতে দেখেছি তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন তদন্তকারীদের। সর্বোচ্চ আদালতের একজন বিচারপতিকে দেখেছি ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা নিয়ে মিথ্যাভর্তি বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট দিতে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারকে দেখেছি জজ মিয়া নামে নিরীহ এক তরুণকে ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার 'মূল হোতা' হিসাবে জনসম্মুখে আনতে। কিন্তু সাংবাদিকরা অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেছিলেন জজ মিয়ার কাহিনি ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সাজানো নাটক। আমি নিজে জজ মিয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছি কয়েকবার। জজ মিয়া আমাকে বলেছেন, গ্রেফতারের পর সিআইডি পুলিশ তাকে গ্রেনেড চিনিয়েছে। কীভাবে গ্রেনেডের পিন খুলে ছুড়তে হয়, ফাটলে কী পরিণতি হয়–সেসব সিআইডি কার্যালয়ে একদল তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে শিখিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল–জজ মিয়া যেন আদালতে বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার সময় গ্রেনেডের নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারেন। এত নাটক করেও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার শেষ পর্যন্ত জজ মিয়াকে ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বলির পাঁঠা বানাতে পারেনি। মামলার তদন্ত বিভ্রান্তিকর অবস্থায় রেখে ২০০৬ সালে ক্ষমতা ছেড়ে যায়।

অবশেষে দুবছর (২০০৭-২০০৮) ক্ষমতায় থাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার প্রথম চার্জশিট আদালতে জমা দেয় ২০০৮ সালে। স্বাভাবিকভাবেই সব গণমাধ্যমে বড়ো খবর হয়েছিল। আমি রিপোর্ট করেছি ডেইলি স্টার পত্রিকার জন্য। চার্জশিট হচ্ছে পুলিশের সফল তদন্তের ফল। আদালতে বিচার শুরু করার জন্য মৌলিক নথি। কিন্তু আমি জানি, চার্জশিটে শতভাগ সত্য উঠে আসে না। তাই আদালতে জমা দেওয়া এই নথির (চার্জশিটের) কপি জোগাড় করি। বহুবার চার্জশিটের আদ্যোপান্ত পাঠ করি। বুঝতে পারি, চার্জশিটটিতে ঘটনার বর্ণনায় অসংগতি ছিল। তদন্ত পূর্ণাঙ্গ হয়নি। চার্জশিটে বেশকিছু বড়ো প্রশ্নের উত্তর ছিল না। সেখানে একটি বাক্যে বলা ছিল–এই গ্রেনেড হামলা সফলভাবে পরিচালনার জন্য হামলাকারী সন্ত্রাসীদের সব ধরনের 'প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের' নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো–এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে চার্জশিটে আর কোনো কিছুই বলা হয়নি। 'প্রশাসনিক সহায়তার' প্রতিশ্রুতি কেমন ছিল? কারা কীভাবে সন্ত্রাসীদের প্রশাসনিক সহায়তা দিয়েছে? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনুসন্ধান শুরু করি। দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে ২০০৯ সালে তথ্যপ্রমাণসহ নিশ্চিত হই যে, কীভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পক্ষ থেকে ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। 'ইট ওয়াজ হাওয়া ভবন প্লট' শিরোনামে আমার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি ছাপা হয় দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায়। এরও দুবছর পর বর্ধিত তদন্তের ভিত্তিতে সিআইডি ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার সম্পূরক চার্জশিট আদালতে জমা দেয়। সেখানে সন্ত্রাসীদের প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সংযোজিত হয়। এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে বলতে চাই, তদন্তাধীন এবং আদালতে বিচারাধীন বিষয়েও সত্য লুকানো হলে, অর্ধসত্য কিংবা মিথ্যা বললে নির্ভয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার সুযোগ আছে। প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উন্মোচন করার স্বার্থে আমরা সাংবাদিকরা এই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করি। এ ধরনের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সত্য-ন্যায়-ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যারা অন্যায় ও অপরাধ করে, তারা সত্য লুকিয়ে রাখতে এবং বিচার ও জবাবদিহিতা এড়াতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে আক্রমণ করে দমাতে চায়। তাদের এমন আচরণ স্বাভাবিক। তাই সাংবাদিককে সত্য উন্মোচনে সততা ও সাহসের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, সেটা আদালত ও বিচারের বিষয় হলেও।

সামরিক আদালত নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

সামরিক বাহিনীগুলোর ভেতরে বিচারের প্রয়োজন পড়লে তাদের আইন অনুসারে আদালত গঠন করে। এর আগে ঘটনার তদন্ত করে, যাকে সামরিক বিচারিক প্রক্রিয়ার ভাষায় 'কোর্ট অব ইনকোয়ারি' বলে, আর আদালতকে বলে 'কোর্ট মার্শাল'। বিচারকাজ শেষ হলে সেই আদালতের বিলুপ্তি ঘটে। সামরিক বাহিনীর ভেতরে প্রয়োজন অনুসারে গঠিত কোর্ট মার্শালের কার্যক্রম সম্পর্কে গণমাধ্যমে খবর আসে না। কারণ, কোর্ট মার্শাল উন্মুক্ত আদালত নয়। সাংবাদিক যেহেতু

হোক ছোটো, মাঝারি কিংবা বড়ো–প্রতিদিনই রিপোর্ট হওয়ার মতো কিছু না কিছু ঘটনা আদালতে ঘটে। নিয়মিত এসব প্রতিবেদনের বাইরেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার দারুণ একটি ক্ষেত্র আদালত বা আদালতকেন্দ্রিক কার্যক্রম

জনগণকে জানানোর জন্য সাংবাদিকতা করেন, তাই সামরিক আদালতে সাংবাদিকতার সুযোগ রাখা নেই। প্রয়োজন মনে করলে সামরিক প্রশাসন গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোনো কোর্ট মার্শাল সম্পর্কে তাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অবগত করে, এ ধরনের চর্চা আমরা অবৈধ সামরিক শাসনামলে দেখেছি। গোপনীয়তা রক্ষা করলেও সামরিক আদালত নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার স্বার্থে নিজের আরেকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করছি।

সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুসারে দেশের প্রথম অবৈধ সেনাশাসক ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। পরে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ১৯৮১ সালের মে মাসে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁরই নিয়ন্ত্রণে থাকা সেনাবাহিনীর একদল কর্মকর্তা ও সৈনিক চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে তাঁকে বার্স্ট ফায়ার করে হত্যা করে। বেশ কজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে জেনেছি, জিয়ার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি, বিএনপি তিনবার রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলেও জিয়া হত্যার বিচারের কোনো সফল অগ্রগতি হয়নি। সিভিল আদালতে এ হত্যার বিচার হওয়ার কথা ছিল। তবে জিয়া হত্যাকাণ্ডে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য জড়িত থাকায় সেনা আইন অনুসারে কোর্ট মার্শালে শুধু সেনা বিদ্রোহের অভিযোগে বিচার হয়েছে। সেটা ছিল সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ গোপন বিচার (কোর্ট ইন ক্যামেরা), যা হয়েছে ১৯৮১ সালে। চট্টগ্রাম জেলখানা ভবনের ভেতরে একটি অংশকে আদালত ঘোষণা করে কঠোর গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে কোর্ট মার্শাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে প্রথমে ৩১ জন সেনা সদস্যের বিচারের আদেশ হলেও পরে ২৯ জনের বিচার হয়। সেই গোপন বিচারে ১২ জন সেনা কর্মকর্তার ফাঁসি হয়, ১০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়া হয়েছিল, কয়েকজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। অতিগোপন সেই সামরিক 'বিচার' অনুষ্ঠানের ১৯ বছর পর আমি অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেছিলাম, বিচারটি ছিল পুরোপুরি প্রহসন ও সাজানো নাটক। প্রকৃতপক্ষে সেটাকে বিচার বলা যায় না। কারণ, একদল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী অফিসারকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বিচারের নামে কোর্ট মার্শালের আয়োজন করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা নিধনের নীলনকশার অংশ হিসাবে বিচারের নামে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। অনুসন্ধানে প্রমাণ মিলেছিল যে, কোর্ট মার্শালে বিচারের আগেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল কাদের বিচার হবে এবং কী শাস্তি হবে। সামরিক আদালত নিয়ে আমার এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০০ সালে। এই কোর্ট মার্শালে বিচারের রায় যে পূর্বনির্ধারিত ছিল, এর একজন সাক্ষী ছিলেন প্রয়াত ভাষাসৈনিক অ্যাডভোকেট গাজীউল হক। তিনি বলেছিলেন, '১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম কোর্ট মার্শালের বিচারকাজ শেষ হওয়ার আগে আমি নিজে দেখেছি ওই মামলার রায় টাইপ হতে। আর তা টাইপ হয়েছে ঢাকা শহরে আমার বাড়ি থেকে কিছু দূরে একজন পরিচিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে।' প্রয়াত অ্যাডভোকেট গাজীউল হক থাকতেন রাজধানীর রামপুরার চৌধুরীপাড়া এলাকায়। কোর্ট মার্শালের বিচার নিয়ে অনুসন্ধানকালে তাঁর বাসায় দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে ১৯ বছর পর প্রমাণসহ উন্মোচিত করা গেছে ১৯৮১ সালের একটি গোপন সামরিক আদালতে বিচারের নামে কী ধরনের অন্যায় করা হয়েছে, কারা কীভাবে সে অন্যায় করেছে এবং কী উদ্দেশ্যে করেছে।

আধা-সামরিক বাহিনীর আদালত

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মর্মান্তিক রক্তাক্ত বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে। সেই বিদ্রোহ নিয়েও ঘটনার প্রথমদিন থেকে বহু প্রতিবেদন আমি দেশি ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের জন্য লিখেছি। তখন বাহিনীটির নাম ছিল বাংলাদেশ রাইফেলস, সংক্ষেপে বিডিআর। সেই নজিরবিহীন রক্তাক্ত বিদ্রোহের পর নাম পালটে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' বা সংক্ষেপে বিজিবি রাখা হয়। কিন্তু নির্মম ঘটনাটি 'বিডিআর বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আধা-সামরিক। ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহের পর যখন সংঘটিত অপরাধগুলোর বিচার করার প্রসঙ্গ সামনে আসে, তখন দেখা যায়, বিডিআর আইন অনুসারে শুধু বিদ্রোহের বিচার করার ক্ষমতা আছে বাহিনীটির; কিন্তু হত্যাকাণ্ডের বিচার করার ক্ষমতা নেই। বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেন। তাই বিডিআর বিদ্রোহের বিচার দুভাবে করার ব্যবস্থা হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আইন অনুসারে তাদের বাহিনীর ভেতরে আদালত গঠন করে শুধু বিদ্রোহের বিচার হয়। আর হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয় ফৌজদারি আইনানুসারে সিভিল আদালতে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবেও মনোযোগ কেড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বিচার নিয়ে নানা চাপও ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে বিডিআর বিদ্রোহের বিচারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বাহিনীর ভেতরের আদালতেও সাংবাদিকদের উপস্থিত থেকে, গোটা বিচার প্রক্রিয়া স্বচক্ষে দেখে রিপোর্ট লেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ফলে সেই বিচারগুলো দেখে রিপোর্ট লেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। সিভিল আদালতে বিডিআর বিদ্রোহে হত্যাকাণ্ডের বিচারও দেখে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন লিখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আধা-সামরিক বাহিনীর আদালতগুলোর বিচার থেকেও বহু ভালো রিপোর্ট তৈরি এবং ভালো সাংবাদিকতা করার সুযোগ থাকে। পাশাপাশি থাকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার অনেক উপাদান।

আদালতের ঘটনার সূত্র ধরে সমাজে মিলে দারুণ খবর

২০১০ সালের ২৬শে আগস্ট হাইকোর্টের একটি ঘটনা হঠাৎ হইচই ফেলে দেয়। উচ্চ আদালতের এক বেঞ্চ একটি রিট মামলার রায়ে দেশের দ্বিতীয় সেনাশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এরশাদের অবৈধ সেনাশাসনকাল ও মার্শাল ল আদেশগুলোকে বৈধতা দেওয়া সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীকেও অবৈধ ঘোষণা করে। সেই রায় সেদিনের সবচেয়ে বড়ো খবর ছিল। অন্য সাংবাদিকদের মতো আমিও রিপোর্ট লিখি, পরদিন ২৭শে আগস্ট প্রধান খবর হিসাবে ছাপা হয় দ্য ডেইলি স্টারে। অবাক করার বিষয় ছিল–রায় ঘোষণার দিন সেনাশাসক এরশাদের সংবিধান সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ করে জয় পাওয়া ঐতিহাসিক রিট মামলার বাদীর খোঁজ কেউ জানতেন না। বাদী কখনো উপস্থিত ছিলেন না আদালতে, তাঁকে কেউ কোনোদিন দেখেনি, কেউ চিনতেন না, এমনকি তাঁর আইনজীবীও না। অথচ সেই বাদীর মামলায় সংবিধান সংশোধনবিষয়ক ঐতিহাসিক রায় হয়েছে। শুধু মামলার নথিতে বাদীর নাম লেখা ছিল সিদ্দিক আহমেদ আর তাঁর গ্রামের ঠিকানা মিলে। সেই তথ্যের সূত্র ধরে রায় ঘোষণার রিপোর্ট লিখে গভীর রাতে রওয়ানা দিই চট্টগ্রামের পথে। সকালে চট্টগ্রাম শহর থেকে আরও ত্রিশ কিলোমিটার দূরে পটিয়া উপজেলার বাথুয়া গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হই। যখন ঘুমহীন ক্লান্ত কিন্তু দারুণ কৌতূহলে উজ্জীবিত দেহে বাথুয়া গ্রামে হাজির হই, তখন মধ্যদুপুর। খুঁজে বের করি ঐতিহাসিক রিট মামলার বাদী সিদ্দিক আহমেদের বাড়ি। অতিদরিদ্র জীবনযাপন করা সিদ্দিক আহমেদের বয়স তখন ৬৪ বছর। মাটির মেঝের ওপর জরাজীর্ণ বাঁশের বেড়া ও টিনের চালের ঘরে তাঁর বসবাস। খুব সামান্য ভিটেমাটি তাঁর। হতদরিদ্র দশার চিহ্ন পাই সর্বত্র। কোনোমতে জীবন চলে তাঁর। দেশের কোনো খবর তাঁর কাছে পৌঁছায় না। কারণ, টেলিভিশন নেই, নেই পত্রিকা রাখার সামর্থ্যও। আমার কাছেই সিদ্দিক আহমেদ প্রথম শুনেন তার মামলায় সেনাশাসক এরশাদের সংবিধান সংশোধনী বাতিলের ঐতিহাসিক রায়ের কথা। জীবনে সংবিধান শব্দটা আগে শুনেছিলেন সিদ্দিক আহমেদ কিন্তু এর বেশি কিছু জানতেন না। কোনোদিন সংবিধান দেখেননি। 'সংবিধান সংশোধন' কথাটি আমার কাছেই প্রথম শুনেছিলেন। কিন্তু এর ফল ও প্রভাব তাঁর বোধগম্য হয়নি। ১৯৮৪ সালে এরশাদের সেনাশাসন আমলে একটি মামলায় 'মিথ্যা আসামি' হিসাবে মার্শাল ল কোর্টে বিচার হয়েছিল সিদ্দিক আহমেদের। এর জেরে দুই দফা জেল খাটেন। দ্বিতীয় দফায় তাঁর ভাই এক আইনজীবী ধরেছিলেন জেল থেকে সিদ্দিক আহমেদকে বের করতে। সেই সূত্র ধরে জেলে থাকতেই সিদ্দিক আহমেদ মার্শাল ল কোর্টে তার সাজার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদনের জন্য ওকালতনামায় সই করেছিলেন। সেখানেই শেষ, এর বেশি আর কিছু জানতেন না। রিট পিটিশন দায়েরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর বিন্দুবিসর্গ জানা ছিল না। সেই মামলার খোঁজও তিনি নেননি। ২০১০ সালের এপ্রিলে জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। আর ওই বছর আগস্টের শেষে আমার কাছেই প্রথম জানতে পারেন তাঁর রিট মামলার ঐতিহাসিক পরিণতি সম্পর্কে। অথচ তার আগের দিন থেকেই তাঁর মামলার রায় নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল আলোচনার উত্তাপ। গণমাধ্যম সব মহাব্যস্ত তাঁর মামলার ঐতিহাসিক রায় নিয়ে রিপোর্ট লিখতে। আদালতের এমন বহু ঘটনার সূত্র ধরে তথ্যানুসন্ধানে নামলে দারুণ সব প্রতিবেদন বের করে আনা সম্ভব।

যখন স্পর্শকাতর সংবাদের বিষয় স্বয়ং বিচারপতি

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরের ঘটনা। একটি যুদ্ধাপরাধ মামলার আপিল শুনানি চলছিল সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে। শুনানি চলাকালে একদিন বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এসকে) সিনহা তার স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার কথা নিজেই বলে ফেলেন। বিচারপতি এসকে সিনহা আদালতে বসে জানান, তিনি নিজে একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রুখতে গঠন করা শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাঙালি নিধনযজ্ঞে সহায়তা করতে দেশজুড়ে শান্তি কমিটি গঠন করেছিল। সেই সংগঠনের সদস্য থাকা ব্যক্তি দেশের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি এবং একটি যুদ্ধাপরাধী মামলার শুনানি করার সময় নিজের মুখে তা জানিয়েছেন। সাধারণত বেশির ভাগ সাংবাদিক একঘেয়ে ক্লান্তিকর লাগে বলে মামলার দীর্ঘ শুনানির সময় আদালতে বসে থাকতে চান না। কিন্তু কোনো সাংবাদিক যদি ধৈর্য নিয়ে বসে থাকেন এবং মন দিয়ে মামলার শুনানি শুনেন, তাহলে যে কোনো সময় এমন অনেক বিষয়ে স্পর্শকাতর বিস্ফোরক তথ্য পেয়ে যেতে পারেন; যা লেখলে সেসব তথ্য আজীবন রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে, স্থান পাবে ইতিহাসে। কিন্তু সেদিন একজন মাত্র রিপোর্টার ছিলেন সেই আদালতে। আমি তখন ইংরেজি ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় প্ল্যানিং এডিটর। নিজে নিয়মিত আদালতে যেতে পারি না বলে একজন তরুণ প্রতিবেদককে পাঠাচ্ছিলাম। তিনি শুরুতে আদালত রিপোর্টিংয়ে ভীত ও অনাগ্রহী ছিলেন। তারপর বিরক্ত ছিলেন সারা দিন আদালতে বসে মামলার একঘেয়ে শুনানি শুনে সংবাদ খোঁজার কৌশল বলায়। আমার শক্ত অবস্থান ও পরামর্শ ছিল–যত খারাপই লাগুক এবং আর কোনো সাংবাদিক না থাকলেও আদালতে বসে মন দিয়ে মামলা শুনতে হবে এবং নোট নিতে হবে। নিরুপায় ওই তরুণ সাংবাদিক সেই পরিশ্রম করেছিলেন সততার সঙ্গে। তাই বিচারপতি এসকে সিনহা যেদিন আদালতে নিজেই নিজের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার কথা বলেছিলেন, সেদিন আমার ওই সহকর্মী রিপোর্টার একা সেই তথ্য পান, নোট নেন এবং উত্তেজনার সঙ্গে আমাকে জানিয়েছিলেন তথ্যটা। কিন্তু ভীত ছিলেন আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির স্পর্শকাতর তথ্য নিয়ে রিপোর্ট লিখে বিপদে পড়বেন কি না? তাকে অভয় দিয়ে আমি গোটা দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমার নিজস্ব সোর্স ব্যবহার করে নিশ্চিত হই রিপোর্টারের তথ্য সম্পর্কে। এরপর তৈরি হয়ে যায় রিপোর্ট, পরদিন প্রথম পাতায় গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয় বিচারপতি এসকে সিনহার স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থানের তথ্য। দেশের আর কোনো গণমাধ্যমে তা প্রকাশ হয়নি। ফলে ঢাকা ট্রিবিউনের ওই একমাত্র রিপোর্টটি সব জায়গায় রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সাহসিকতা ও ধৈর্যের ফলে এমন একটি স্পর্শকাতর কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের রেকর্ড রাখা গেছে, যা ইতিহাসের স্বার্থে প্রয়োজনের সময় রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এমনকি সেই তথ্যের সূত্র ধরে একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এসকে সিনহার স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা বিস্তারিত অনুসন্ধান করার সুযোগ বরাবরই থাকবে, অনুসন্ধান করলে ইতিহাসের আরও অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে, আরও অনেক ব্যক্তির ভূমিকা জানা যাবে। সমাজের সব ক্ষেত্রের সব বিষয় নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ আদালতে যান। তাই সব বিষয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টের পেছনে ছোটার একটি বড়ো সুযোগ করে দেয় আদালতকেন্দ্রিক সব ধরনের কর্মকাণ্ড। আদালত শুধু নিয়মিত খবরের খনি নয়, আদালত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতারও দারুণ খনি। সেই খনি থেকে মহামূল্যবান রত্নসম সব অনুসন্ধানী রিপোর্ট বের করে আনতে রিপোর্টার, সম্পাদক ও মালিকের বুকে থাকা চাই শুধু সদিচ্ছা, সাহস, সততা আর ধৈর্য।

***লেখক:** সিনিয়র সাংবাদিক*

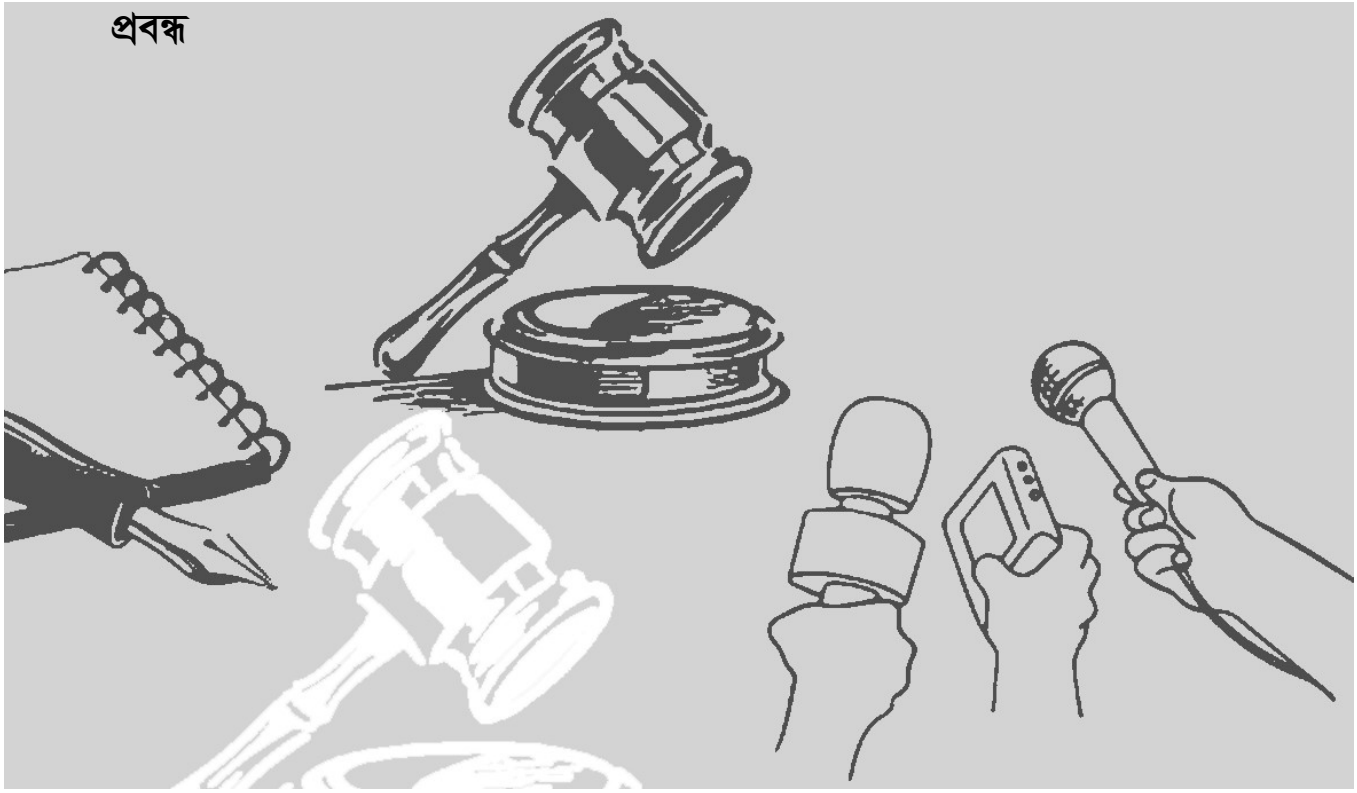

সংবাদপত্রে কোর্ট রিপোর্টিংয়ের অনুষঙ্গ

■ আলী আসগর স্বপন

সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সত্য প্রকাশ করাই হলো সৎ সাংবাদিকতা। খবর তৈরি বা সৃষ্টি করা সাংবাদিকের কাজ নয়। একজন সংবাদকর্মীর কাজই হলো ঘটে যাওয়া ও অন্তর্নিহিত বিষয় জনগণকে অবহিত করা। এজন্য তাঁকে সংবাদের উৎসমূলে যেতে হয়। তিনি যা দেখেছেন, শুনেছেন বা খুঁজে পেয়েছেন, তা জনগণকে অবহিত করাই তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্ম।

আমাদের দেশের গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীরা বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে খবর সংগ্রহ ও পরিবেশন করে জনমানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে কেউ খেলাধুলার খবর নিয়ে আগ্রহী, কেউবা অপরাধ বা অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে। তেমনই আদালতে ঘটে যাওয়া নানা খবরাখবর নিয়েও জনমানুষের আগ্রহ সীমাহীন।

এ প্রসঙ্গে উনসত্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়ে এদেশের জনমানুষের কৌতূহলের সীমা ছিল না। সেসময় দৈনিক ইত্তেফাক আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলার বিবরণ সবিস্তারে প্রকাশ করে মানুষের চেতনাকে শানিত করেছে। একইভাবে বাংলার বাণী অপরাধজগতের চাঞ্চল্যকর শারমিন রীমা হত্যা মামলায় মুনীর-খুকুর পরকীয়ার পরিণতি সম্পর্কে জনমানুষকে আলোড়িত করেছে। এরশাদের পতনের পর তার

নানাবিধ কীর্তিকলাপের মামলার খবরাখবরও জানার আগ্রহ মানুষের পাঠকপ্রিয়তার বিষয় হয়ে ওঠে।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিস্তারিত দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশ করে। শত কৌতূহলের জবাব পেয়েছে এদেশের আপামরসাধারণ। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে এদেশের জনমানুষের একটি আগ্রহের বিষয় আদালতকেন্দ্রিক ঘটনাবলি। দৈনিক প্রথম আলো প্রকাশ করে শাজনীন ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিস্তারিত বিবরণ। এ নিয়ে নিকট অতীতের আরও কিছু চাঞ্চল্যকর মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে আলোচিত ঘটনা ১৯৭৮ সালে সাংবাদিক দুলাল হত্যা, বরিশালের চাঁপা হত্যা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিদারাবাদ হত্যাকাণ্ড এবং তা নিয়ে অপরাধীদের বিচার বা এসব ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো কীভাবে সুরাহা হলো, তা নিয়ে জনমানুষের উৎকণ্ঠা ছিল প্রচুর। সংবাদকর্মীরা এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ বা পরিবেশন করে মানুষকে স্বস্তিতে রেখেছে। তাই মানুষের কাছে আদালতের সংবাদের পাঠকপ্রিয়তা দিনদিন বেড়েছে এবং আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ আইন-আদালত সম্পর্কে জানতে বা বুঝতে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আদালতবিষয়ক সাংবাদিকরা মানুষের এ আগ্রহের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে আইন-আদালত বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করে একটি অন্যতম অনুষঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই হিসাবে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে আইন-আদালতের খবরাখবর।

এই সংবাদ পরিবেশনে অতি সতর্কতার প্রয়োজন বিধায় একসময় আইনজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে সাংবাদিকতা করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে আইন-আদালতবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের জন্য আইনজীবীনির্ভর না হয়ে পেশাদারি সাংবাদিকতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই হিসাবে প্রতিটি গণমাধ্যমেই আইন-আদালত বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের জন্য পেশাদারি সার্বক্ষণিক সংবাদকর্মী নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে কোর্ট রিপোর্টিংয়ের ওপর বিস্তর জ্ঞানের জন্য সাংবাদিকতা শিক্ষায় পৃথক বিষয়েই পাঠদান করা হয়ে থাকে।

কোর্ট রিপোর্টিংয়ে ঝুঁকি থাকায় বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় কেবল প্রাথমিক ধারণা নয়, সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। একটি চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ কম নয়। উৎসাহই বেশি। কী হলো ঘটনার বা শেষ পরিণতি নিয়েই মানুষের অপেক্ষার অন্ত থাকে না। মানুষ জানতে চায় ঘটনার ফলোআপ এবং জানতে চায় ঘটনার ফলাফল। সেই সঙ্গে ঘটনায় জড়িতদের পরিণতিও জানার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। মানুষের জানার তৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। জনগণের কথা মনে রেখেই আদালতও তার ন্যায়দণ্ড সঠিক রাখার চেষ্টায় প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। আদালত চান সঠিক ও ন্যায়বিচার হোক। সেই সঙ্গে আদালত উৎসাহিত হয়ে শুধু বিচার করলেই হবে না, বিচারকে দৃশ্যমানও করতে হয়। তাই আদালত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সচেষ্ট হন। আদালত চান মানুষের বিচারপ্রাপ্তির শেষ আশ্রয় যেন আদালতই হয় এবং আদালতের প্রতি জনমানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা যেন অক্ষুণ্ন থাকে।

একজন কোর্ট রিপোর্টার আদালতের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠেন। একজন সৎ সাংবাদিক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব হয়ে পড়ে তাঁর পরিবেশিত সংবাদটি যেন পক্ষপাতমূলক না হয়। গণমাধ্যমকর্মী যেন নিজেই বিচারক না হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে তাঁর সতর্ক থাকা জরুরি। কোনোভাবেই যেন মিডিয়া ট্রায়ালের ভিকটিমে পরিণত না হয় কোনো পক্ষ, সেজন্য সজাগ সতর্ক থাকাটাও জরুরি। যে কোনো ঘটনা বা মামলার দুটি পক্ষ থাকে, দুপক্ষই চায় ন্যায়বিচার। সংবাদকর্মীর কার্যকলাপে বা সংবাদ প্রকাশে জনমানসে যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়। মামলার বিচারের সময় উভয় পক্ষই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। সাক্ষ্যগ্রহণ, জেরা, যুক্তিতর্ক ইত্যাদি উপস্থাপনের সময় উভয় পক্ষই নানাবিধ উদাহরণ ও অতীত ঘটনার অবতারণা করে। সংবাদকর্মী মূল বিষয় ছেড়ে যেন উৎক্ষেপণ বা উদাহরণের ওপর গুরুত্ব বা নির্ভরশীল হয়ে না যান। সংবাদকর্মী যেন নিজের অজান্তে বা অতি উৎসাহী হয়ে কোনো পক্ষ না হয়ে ওঠেন। কোর্ট রিপোর্টিংয়ে মামলার বিচারের প্রয়োজনে বিচারকের কোনো মন্তব্য যেন রিপোর্টিংয়ের মূল বিষয় না হয়ে ওঠে। তিনি যা বলছেন, তা মামলার প্রয়োজনে, জনগণের জন্য নয়। এ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া সঠিক কোর্ট রিপোর্টিং নয়। কারণ, বিচারকের মন্তব্য নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। কোনো রিপোর্টিংয়ে আদালতকে হেয় করা সমীচীন নয়। বিচারক ও আদালতের ওপর বিচারপ্রার্থীর মধ্যে কোনো প্রকার আস্থার ঘাটতি যেন সৃষ্টি না হয়, এ বিষয়ে কোর্ট রিপোর্টিংয়ে সচেতন থাকা জরুরি। আদালত অবমাননার বিষয়টিও বিবেচনায় থাকা জরুরি।

মামলার রায় বা ফলাফল নিয়ে, রায় বা আদেশ নিয়ে সংবাদ পরিবেশন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে তবেই তা প্রচার করা সঠিক কোর্ট রিপোর্টিং। মামলার রায় নিয়ে আগাম বা ধারণাপ্রসূত বা নিজস্ব মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই, তা করতে যাওয়াও আইন ও বিচারবহির্ভূত বিষয়। তাই এ নিয়ে কোর্ট রিপোর্টিং করার কোনো সুযোগ নেই। কোর্ট রিপোর্টিংয়ে এসব কারণে আইন ও আদালত বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ও ধারণা থাকা একজন কোর্ট রিপোর্টারের অতিরিক্ত যোগ্যতারই পরিচায়ক।

কোর্ট রিপোর্টিংয়ের মূল বিষয় হলো আদালত, বিচারব্যবস্থাকে কখনো ব্যক্তিপর্যায়ে না ভেবে একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা এবং একজন রিপোর্টার অবশ্যই জনগণের একজন হয়েই সব অবলোকন করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিবেন–এটাই সৎ সাংবাদিকতার পরিচায়ক। সময়ের প্রয়োজনেই কোর্ট রিপোর্টিংয়ের গুরুত্ব যে কোনো গণমাধ্যমে অপরিসীম। আমাদের দেশের জনমানুষের দেশের প্রচলিত আইন ও বিচারব্যবস্থা বা বিচারের রীতিনীতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানার অভাব রয়েছে। তাই দেশের মানুষকে আইনকানুন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা বা গণসচেতনতার প্রয়োজনেই গণমাধ্যমে কোর্ট রিপোর্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক: সাংবাদিক ও আইনজীবী

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

আইনবিষয়ক সাংবাদিকতার উৎকর্ষ ও কর্মপরিধি বেড়েছে

■ ওয়াকিল আহমেদ হিরন

২০০২ সালের প্রথমদিকের ঘটনা। নবীন রিপোর্টার হিসাবে দৈনিক ভোরের ডাক পত্রিকায় কাজ করি। চিফ রিপোর্টার ছিলেন প্রয়াত পথিক সাহা। রাজধানীর তোপখানা রোড অফিসে একদিন সন্ধ্যায় কাজের ফাঁকে দাদা (পথিক সাহা) ডেকে বললেন, 'সুপ্রিমকোর্টে মাঝেমধ্যে বেশ ভালো রিপোর্ট থাকে। আমাদের ওখানে কেউ নেই, কাল থেকে তুই ওখানে যাতায়াত শুরু কর।'

চিফ রিপোর্টার বলা মানেই শেষ কথা। পরদিনই ভয়ে ভয়ে হাইকোর্টে গেলাম। বাঙালি হাইকোর্টের নাম শুনলে তো এমনিতেই ভয় পায়। আমার অবস্থাও হলো তেমন। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট কোনো বসার জায়গা না থাকায় সেদিন আর কোনো সাংবাদিককে খুঁজে পাইনি। দুদিন পর আবার সেখানে গেলে সুপ্রিমকোর্ট ভবন ও সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের সংযোগ সেতুর ওপর দেখা হলো প্রথম আলোর শহীদুজ্জামান ও দৈনিক ইত্তেফাকের সালেহউদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে। কুশলাদি বিনিময়ের পর আদালত বিটে কাজ করার আগ্রহের কথা তাঁদের জানাই। এরপর পর্যায়ক্রমে ইউএনবির ফারুক কাজী (প্রয়াত), যুগান্তরের কাজী আব্দুল হান্নান, দৈনিক জনকণ্ঠের আলী আসগর স্বপন, আজকের কাগজের আবদুর রহমান, সংবাদের মুজতবা খন্দকার, ভোরের কাগজের শংকর মৈত্র, আমার দেশের অলিউল্লাহ নোমান, দৈনিক দিনকালের বদিউজ্জামানসহ আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের পেছনে প্রতিদিন ঘুরি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত। এই থেকে শুরু হয় আমার আইন-আদালত বিটে কাজের পথচলা।

এরই মধ্যে ২০০৪ সালে দৈনিক আজকের কাগজে যোগদান করি। সেখানে থেকে দুবছর পর ২০০৬ সালে সমকালে যোগদানের পর অদ্যাবধি কাজ করছি।

২০০২ সালে সুপ্রিমকোর্টে সাংবাদিকতা শুরু করা আমার কাছে খুবই কঠিন ছিল। আইন ও আদালতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার পাশাপাশি একটা অজানা ভয় সব সময় কাজ করত। তবে গত দুই দশকে এই অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

মামলার শুনানি পর্যায়ে বিচারকের মৌখিক বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশে বাধা থাকতে পারে না। আদালতের মধ্যকার যে কোনো আলোচনা জনস্বার্থেরই বিষয়। এক্ষেত্রে বিচারক ও আইনজীবীর মধ্যে চলা সংলাপের মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়া কীভাবে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে

সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণে পেশাদার সাংবাদিকরা এখন নিয়মিত যান। আর সুপ্রিমকোর্ট তথা বিচার বিভাগের খবরকে গণমাধ্যমের কাছে আকর্ষণীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য করে তোলার পেছনে ছিল একদল রিপোর্টার। অগ্রজদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

আইন-আদালত অঙ্গনে দীর্ঘ ২১ বছর কাজ করার পর এখনো মনে হচ্ছে, আদালত সাংবাদিকতায় কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে সেসব সীমাবদ্ধতাকে সঙ্গী করেই আমরা আদালত অঙ্গনের চলমান বিষয়গুলোকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি। সুপ্রিমকোর্টসহ দেশের বিভিন্ন আদালতের মামলার বিচার কার্যক্রম, রায় ও আদেশের খবরের প্রতি মানুষের রয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। আলোচিত কোনো মামলার রায় বা আদেশ জানতে পাঠক, দর্শক ও শ্রোতা এখন উদ্‌গ্রীব হয়ে চোখ রাখেন সংবাদমাধ্যমগুলোয়। তাদের এই কৌতূহল কিংবা তথ্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট আদালতকেন্দ্রিক গণমাধ্যমকর্মীরা। তাই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে গণমাধ্যমকর্মীরা আদালতের বিচারক-আইনজীবী কিংবা মামলার ফলাফল প্রচার ও প্রকাশ করে থাকেন।

তবে মন খারাপের বিষয় হচ্ছে, আদালতে শুনানির সময় বক্তব্য কিংবা মন্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশের পর অনেকক্ষেত্রে আমাদের দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়। অনুরাগ-বিরাগের এক 'প্রচ্ছন্ন ভয়' আমাদের চিন্তার জগতে ভর করে। উচ্চ আদালতে মাঝেমধ্যেই কথা উঠে শুনানির সময় বক্তব্য ধরে সংবাদ প্রকাশ করা নিয়ে। বিচারক ও আইনজীবীরা প্রশ্ন রেখে মাঝেমধ্যেই বলেন, মামলার শুনানিতে আদালতে অনেক বিষয়ে কথা বা মন্তব্য হতে পারে। সেগুলো কেন মিডিয়ায় চলে আসবে?

এমন প্রশ্নের উপযোগী উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড় ও বিচারপতি এমআর শাহের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ থেকে। ২০২১ সালে এক মামলার শুনানিতে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের এই বেঞ্চ বলেন, 'মামলার শুনানি পর্যায়ে বিচারকের মৌখিক বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশে বাধা থাকতে পারে না। আদালতের মধ্যকার যে কোনো আলোচনা জনস্বার্থেরই বিষয়। এক্ষেত্রে বিচারক ও আইনজীবীর মধ্যে চলা সংলাপের মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়া কীভাবে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। আর আদালতের মধ্যকার আলোচনা নিয়ে প্রতিবেদন হলে তা বিচারকদের জন্য আরও জবাবদিহিতা এনে দেবে এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি নাগরিকদের আস্থা বাড়িয়ে তুলবে।' আমাদের দেশে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকরা স্বাধীন দায়দায়িত্ব পালন করতে পারেন কি না বা পারলেও কতটুকু, তা নিয়ে নানামুখী আলোচনা রয়েছে।

দুই দশক ধরে আমাদের দেশে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা বা চালুর ক্ষেত্রে একরকম বিপ্লব ঘটেছে। সাংবাদিকদের পেশাদারি, দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে কর্মপরিধি। মাঠের সাংবাদিকদের জন্য রয়েছে বিটভিত্তিক সংগঠন। এখন বিভিন্ন বিট থেকে চৌকশ ও পারদর্শী রিপোর্টার তৈরি হচ্ছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সচিবালয়, নির্বাচন কমিশন, ক্রাইম, ডিপ্লোম্যাটিক, আইন ও আদালত, শেয়ারবাজার, ব্যাবসা, স্পোর্টস, পরিবেশ, টেলিকমসহ অনেক বিষয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিটের সাংবাদিক তৈরি হচ্ছেন, যা এ পেশার জন্য খুবই আশার আলো। এর মধ্যে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ল রিপোর্টার্স ফোরাম (এলআরএফ) অন্যতম।

বর্তমান সময়ে আইন ও আদালত অঙ্গনে সাংবাদিকদের সরব উপস্থিতি এবং আইন-আদালতের বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একসময় আইন ও আদালতের বিষয়ে আইনজীবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সাংবাদিকতা করতেন। এর মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন (সংবাদ), প্রাণিসম্পদমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শ ম রেজাউল করিম (প্রথম আলো), অ্যাডভোকেট মঞ্জুর কাদের (দৈনিক ইত্তেফাক), হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর (ডেইলি স্টার), বিচারপতি রিয়াজউদ্দিন খান (বাংলাদেশ অবজারভার), বিচারপতি কেএম হাফিজুল আলম (যুগান্তর) প্রমুখ।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে আইন ও আদালতের রিপোর্টিংয়ের পরিবর্তন এসেছে। কোর্ট রিপোর্টিংয়ের পরিধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রত্যেক জাতীয় দৈনিক-টেলিভিশন-অনলাইন অফিস থেকে এ বিটে রিপোর্টার রাখা হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন দুই ডজন রিপোর্টার নিয়মিত আদালত অঙ্গন থেকে খবর সংগ্রহ ও পরিবেশন করছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টারদের রিপোর্ট প্রায়ই জাতীয় দৈনিকগুলোয় প্রধান শিরোনামে ছাপা হচ্ছে। প্রায়ই টিভিগুলোয় ব্রেকিং নিউজ বা অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এখন আইন-আদালতের খবর হাতের মুঠোয়। ইদানীং আদালতপাড়ায় বড়ো কোনো ঘটনা ঘটলেই খবর সংগ্রহের জন্য হাজির হচ্ছে অনলাইন টিভি, ইউটিউব ও ফেসবুক। ফেসবুক ও ইউটিউব জার্নালিজম বর্তমান সময়ে প্রবহমান নদীর মতো গতি পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই খুশির খবর।

আইন সাংবাদিকতায় এসে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার কার্যক্রম দেখার ও কাভার করার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, জেলহত্যা মামলা, বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ মামলা,

সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী মামলা, একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের (যুদ্ধাপরাধী) মামলা, ভয়াবহ একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা, খালেদা জিয়ার দুর্নীতির মামলাসহ উল্লেখযোগ্য অসংখ্য মামলা।

সাংবাদিকতা ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর পেশা। এরপরও বলব, আইনবিষয়ক সাংবাদিকতা আরও ঝুঁকিপূর্ণ। অনিশ্চিত কর্মস্থল, ঝুঁকিপূর্ণ জীবন ও নির্দিষ্ট সময়হীন কর্মময় জীবন সাংবাদিকদের। তাছাড়া আদালত রিপোর্টিং একটু ভিন্নধর্মী। পরিবেশন করা তথ্য যেন বিকৃত না হয়, সেজন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, বিচারাঙ্গন হচ্ছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য বিটের মতো এ বিটে সংবাদ পরিবেশনের দিগন্ত অবারিত নয়। সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার বিষয়ে এখানকার সংবাদকর্মীকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। আদালত বা বিচারকের মন্তব্য নিয়ে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। যাতে বিচারক বা আদালতের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়। বিচারপ্রার্থীও যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন। আদালত বা বিচার বিভাগের ওপর জনগণের আস্থা যেন হারিয়ে না যায়। কোনোভাবেই যেন ব্যক্তিগত মতামত প্রতিফলিত না হয়। একজন অভিযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দোষী প্রমাণের আগেই যেন তদন্ত বা বিচার চলাকালে মিডিয়া ট্রায়ালে ভিকটিমে পরিণত না হন, সেদিকেও সতর্ক রাখতে হবে। কারণ, সবাই আদালতের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন।

আদালতে মামলার রায় বা আদেশের কপি হাতে পাওয়ার পর বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রকাশ বা প্রচার করা উচিত। স্পর্শকাতর মামলার বিচারিক কার্যক্রম, রায় ও আদেশের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়। উপস্থিত থেকে বুঝে-শুনে রিপোর্টিং করলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মামলার উভয় পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য নিয়ে নিখুঁতভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়।

যেনতেনভাবে এবং অনুমানভিত্তিক বা ধারণার ওপর নির্ভর করে আদালতের কোনো রিপোর্ট ছাপা হওয়া সমীচীন নয়। অন্যের কপি দেখে কপি করাও অনেকক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। এজন্য একজন রিপোর্টারকে সংবাদবিষয়ক আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরি।

সবশেষে বলব, আদালত রিপোর্টিং সত্যিকার অর্থে একটি কষ্টকর কাজ। এটা আরাম-আয়েশের পেশা নয়। সব মিলিয়ে কঠিনকে ভালোবাসার পেশাই সাংবাদিকতা। শত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতির সামনে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ উপস্থাপন করতে পারাটাই একজন রিপোর্টারের সফলতা। তবে সামান্য অসতর্কতা বা অবহেলার কারণে প্রতিবেদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ গোটা সংবাদ পরিবারই বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত হতে পারে। তাই আইনবিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীদের অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় মানহানি বা আদালত অবমাননার মতো অপরাধের সম্মুখীন হতে পারে।

লেখক: *জ্যেষ্ঠ রিপোর্টার, সমকাল*
সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ল রিপোর্টার্স ফোরাম (এলআরএফ)

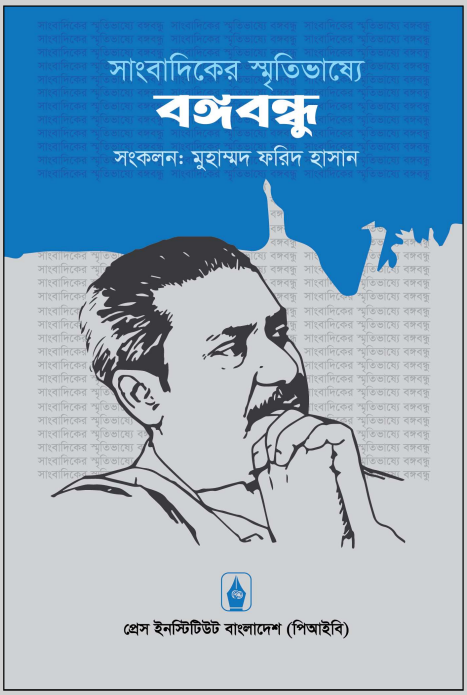

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

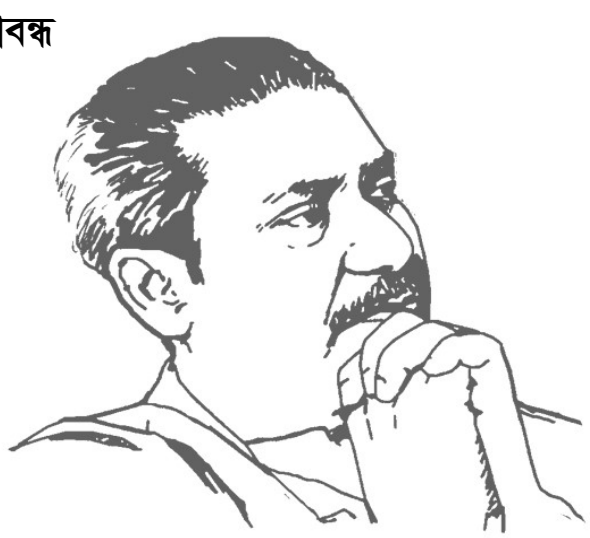

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত বিচার দেখা জীবনের সবচেয়ে সার্থকতা

■ শামীমা আক্তার

তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, কোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। সময়টা ২০০৯ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি। অ্যাডভোকেট আনিসুল হক (বর্তমান আইনমন্ত্রী) তড়িঘড়ি করে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আমাকে সামনে পেয়ে জানালেন, শফিক আহমেদ ও কামরুল ইসলাম (তৎকালীন আইনমন্ত্রী ও আইন প্রতিমন্ত্রী) প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তিনিও যাচ্ছেন সেখানে। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী দুজনই সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ছিলেন। সেই সুবাদে দুজনকেই আগে থেকে জানতাম। সময় নষ্ট না করে ক্যামেরাম্যান নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান গেটের সামনে চলে গেলাম, যেখানে দেওয়ালের গায়ে বাংলাদেশের মানচিত্রটি খচিত আছে। বলে রাখা প্রয়োজন, তখনও প্রতিদিন আমি একটি প্যাকেজের অর্থাৎ একটি নিউজ যত দ্রুত করা যায়, সেই চেষ্টায় থাকতাম। এর প্রধান কারণ, দেড় বছর বয়সি একমাত্র ছেলেকে বাসায় রেখে আমার কর্মক্ষেত্রে যেতে হতো।

দুধের শিশুকে বাসায় রেখে কর্মক্ষেত্রে যে খুব স্বস্তিতে থাকতাম না, তা প্রত্যেক কর্মজীবী মা মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রতিমুহূর্তেই নানা অজানা আতঙ্কে ভুগতাম বাসায় ছেলেটি আমার কেমন আছে, কী করছে, কী খাচ্ছে ভেবে। সন্তানকে বাসায় রেখে কর্মজীবনে লড়াইয়ের গল্পটা খুব যে মধুর না, তা এ দেশের সব কর্মজীবী নারীরই জানা। এ নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলতে চাই না। ফিরে যাই স্মৃতিকথায়।

দুই.

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে আইনমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী নেমে এলে কী বিষয়ে আলাপ হয়েছে জানতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা তাঁদের ঘিরে ধরলেন। মৃদুভাষী আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ জানালেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত বিচারের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এরপর যত রকমেরই প্রশ্নবাণে তাঁদের জর্জরিত করা হলো, মন্ত্রীর সাফ কথা, 'অপেক্ষা করেন, পরে জানতে পারবেন, কবে, কীভাবে, কী হবে।'

আমাদের মধ্যে একটি শঙ্কা ছিল। কারণ, আগস্টে সুপ্রিমকোর্টে একটি দীর্ঘকালীন অবকাশ শুরু হয়। শুনানি কবে শুরু হবে, তা নিয়ে সবার মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ। তিনি জানালেন, সবকিছু ছুটির পরে জানা যাবে। সাংবাদিকদের অনেক প্রশ্নোত্তর অজানা থাকতেই তৎকালীন আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ক্যামেরার সামনে থেকে সরিয়ে মন্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আমরা তখন একজন আরেকজনের সঙ্গে নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে নিজেদের মতো করে উত্তর দিতে শুরু করলাম। তখন আমাদের মাঝে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ফারুক কাজী ভাই ইউএনবিতে কাজ করতেন। তিনি আমাদের থামিয়ে বললেন, এই মামলার আগের বিচারের ধাপগুলো সাংবাদিক হিসাবে তিনি কাভার করেছেন। সুতরাং বিচার শুরু হলে প্রতিদিন সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে আদালতে বসে থেকে। কোনো ধরনের ভুল করা চলবে না। যদি কোনো ধরনের ভুল হয়, তাহলে আদালত তলব করে কোর্টে এনে দাঁড় করিয়ে রাখবে হাতজোড় করে। একই সঙ্গে তিনি জানালেন, নিম্ন আদালতের বিচারে অনেক সাংবাদিকই এভাবে আদালতের তলবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। যাই হোক, অফিসে এসে নিউজ করলাম। সেদিন বিষয়টি প্রধান খবর হয়েছিল।

অফিসে সবার কাছে বলতে থাকলাম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শুরু হচ্ছে। যার সঙ্গে আলাপ করছি, তখনই হতাশ হচ্ছি। সবাই বলছে এ মামলার বিচার শেষ করবে না সরকার, এ মামলায় কাউকেই শাস্তি দিতে পারবে না সরকার। কারণ, আসামিরা অনেক শক্তিশালী

অফিসে সবার কাছে বলতে থাকলাম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শুরু হচ্ছে। যার সঙ্গে আলাপ করছি, তখনই হতাশ হচ্ছি। সবাই বলছে এ মামলার বিচার শেষ করবে না সরকার, এ মামলায় কাউকেই শাস্তি দিতে পারবে না সরকার। কারণ, আসামিরা অনেক শক্তিশালী। তাদের ক্ষমতা আকাশসমান। খুবই মনঃকষ্ট নিয়ে সেদিন অফিস থেকে চলে গেলাম। সম্ভবত বিচার শুরু হয়ে বিচার বন্ধ হবে– এ আশঙ্কায় বারবারই মন খারাপ হচ্ছিল।

পরদিন আবার আদালতে গেলাম। মামলাটি নিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম স্যার যে আমাকে নিজের কন্যাসম স্নেহ করতেন সেসময় সুপ্রিমকোর্টে যারা সাংবাদিকতায় ছিলেন তারা সবাই তা জানত।

আমি সরাসরি স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম এই মামলার বিচারে কী হবে, কবে নাগাদ হবে? তিনি জানালেন, প্রধান কৌঁসুলি আনিসুল হকসহ একটি আইনজীবী প্যানেল করা হয়েছে। সেই প্যানেলের কাঁধে মামলার রাষ্ট্রপক্ষ পরিচালনার সব দায়িত্ব । কারা আছে এ প্যানেলে–এমন প্রশ্নের উত্তরে মাহবুবে আলম স্যার জানান, অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এ মামলার প্রধান আইনজীবী, যিনি অ্যাটর্নি সমমর্যাদার। সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, নুরুল ইসলাম সুজন, ড. তৌফিক নেওয়াজ ও শেখ ফজলে নূর তাপস সহযোগিতা করবেন আনিসুল হককে। টিমে কাজ করবেন মোশাররফ হোসেন কাজল, তৌফিকা করিম, মমতাজ উদ্দিন মেহেদীসহ আরও কয়েকজন আইনজীবী। যাদের সবার নাম এখন মনে পড়ছে না। অ্যাডভোকেট আনিসুল হককে প্রধান কৌঁসুলি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে, এটা জানতে পেরে স্বস্তি পেলাম এই ভেবে, মাহবুবে আলম স্যার আমাকে স্নেহ করেন আর আনিসুল হক সাহেব সাংবাদিক হিসাবে গুরুত্ব দিতেন। মামলাটি যে এবার সমাধানের পথ দেখবে, এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিলাম তখনই। পিতা সিরাজুল হক সাহেবের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পুত্র আনিসুল হকের কাঁধে। মনে মনে আমিও আনন্দ অনুভব করলাম এই ভেবে যে- যদি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত বিচারের রায়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি, ইতিহাসের কলঙ্কমোচনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পারি সাংবাদিক হিসেবে, তাহলে জীবনে সাংবাদিকতা করার সার্থকতা খুঁজে পাব। বিচারপতি এম রুহুল আমিন তখন প্রধান বিচারপতি হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই মামলার বিচারকাজে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি মোজাম্মেল হক, বিচারপতি বি কে দাস, বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ও বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম।

আপিল বিভাগের সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এজলাসের সঙ্গে লাগোয়া ছয়টি চেয়ার দিয়ে। এছাড়া পেছনের দিকেও সাংবাদিকদের বসার অনুমতি ছিল। শুনানি শোনার সুবিধার্থে সামনের ওই চেয়ারগুলো দেওয়া ছিল। প্রথম দিন থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল, প্রতিদিন সবার আগে আদালতে এসে সামনে বসা নিশ্চিত করব, শুনতে চাই কাছ থেকে এই মামলার প্রতিটি শব্দ। শুনানিতে প্রত্যেক আইনজীবী পেপারবুকে থাকা সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে আদালতের কাছে নিজেদের যুক্তি তুলে ধরতেন। বেশ কয়েকজন সাক্ষীর বর্ণনা পড়ার সময় প্রধান কৌঁসুলি আনিসুল হক সাহেবের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসতে শুনেছি, দেখেছি চোখ ছলছল করতে বহুবার এবং এ বিষয়গুলো নিয়েই আবার আদালত কোনো প্রশ্ন করলে তার বিশদ বর্ণনা করতে হয়েছে এই আইনজীবীদের সাক্ষ্য পাতা খুঁজে খুঁজে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে কী হয়েছে, তা সবারই জানা। তবে সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আদালতে যে চিত্র ফুটে উঠত, সেটি আদালত কক্ষের বাইরের কারোই অনুভব করার কথা না। থমথমে একটি কোর্ট কক্ষে যখন শিশু রাসেলকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে বলে প্রতারণা করে হত্যা করা হয়, সে কথাটি যতবার শুনছি, ততবার মনের অজান্তে নিজের আঙুল কামড়ে ধরেছি।

স্পষ্ট মনে আছে, একদিন আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছি, পেছন থেকে স্বভাবসুলভভাবে মতিন খসরু স্যার ডাকলেন, 'এই সাংবাদিক!' পেছন ঘুরে সালাম দিয়ে জানতে চাইলাম, 'স্যার কী হবে?' তিনি হাসতে হাসতে বললেন, দেখই না কী হয়! আগের পরিস্থিতি এখন অনেক বদলেছে। শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায়। এ বিচার শেষ করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। একই সঙ্গে তিনি জানালেন দেশি-বিদেশি নানা চাপের কথাও। প্রতিদিন শুনানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে প্রথমে কখনো প্রধান কৌসুলি, কখনো অ্যাটর্নি জেনারেলের সাক্ষাৎকার নিয়ে, আসামিপক্ষের আইনজীবীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে অফিসে এসে তড়িঘড়ি করে নিউজ করে পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতাম। সকালে সবার আগে কোর্টে যাওয়া। মনে আছে, তখন ফারুক কাজী ভাইয়ের পাশেই বসতাম। ফারুক কাজী ভাই আদালতের প্রতিটি শব্দ বুঝতেন এবং আমাদের বোঝাতেন। ফারুক ভাইয়ের একটি স্বভাব ছিল কেউ যদি ওনাকে কোনো প্রশ্ন করত, তাহলে উনি বিশদ আলোচনা করতেন। সেই সময় এটিএন বাংলা থেকে মাসুদুল হক এ মামলার সংবাদ সংগ্রহ করতেন। মাসুদুল হকের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি অনেক বেশি। বিশেষ করে আইনজীবীদের ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যাপারে মাসুদ ভাইয়ের জুড়ি মেলা ভার। যত দ্রুত সম্ভব যে কোনো আইনজীবীকে তিনি ম্যানেজ করতেন খুব সহজে। প্রতিদিন এক রুটিন। সকাল ৯টায় কোর্টে উঠে সোয়া ১১টা পর্যন্ত একটানা শুনানি। পরে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের চা-বিরতির পর আবার কোর্ট শুরু হয়ে সোয়া ১টা কখনো বা দেড়টা পর্যন্ত শুনানি চলে। মজার বিষয় ছিল, সেই সময় প্রায়ই শুনানি শেষে দেখতাম কোর্ট কক্ষের পেছনের বেঞ্চে বসে কখনো দীপু মনি, কখনো বা হাছান মাহ্মুদ কিংবা সরকারের পদস্থ অন্যান্য কেউ না কেউ শুনানি শুনছেন সাধারণ মানুষের মতো করে। সেই সময় সুপ্রিমকোর্টে এক গোয়েন্দা ছিল, যাকে সবাই চিনতেন। নাম তার শামসুদ্দিন। তাকে আমরা শামসু ভাই বলে ডাকতাম। তিনি খুব বেশি সময় কোর্টের ভেতরে থাকতেন না, তবে আমাদের কাছ থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে নোট নিতেন আর বলতেন রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হচ্ছে, প্রতিটি শব্দই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। গোয়েন্দাদের তৎপরতা দেখে তখন বুঝতে পারতাম তার কথার সত্যতা। একদিন ড. তৌফিক নেওয়াজ শুনানি করছেন, যিনি বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি'র স্বামী। সময়টা ২০০৯ সালের ১২ নভেম্বর। টানা ২৯ দিন শুনানির পর আদালত রায়ের তারিখ ঠিক করেন ১৯ নভেম্বর। প্রতিদিন একটি একটি মুহূর্ত করে ক্ষণগণনা শুরু হলো ১৯ নভেম্বরের অপেক্ষায়।

তিন.

সবকটি টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার সাংবাদিকরা সেই দিনটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আদালতে এলেন। পুরো আদালতে চার স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলো। যথাসময়েই আদালতে গিয়েছিলাম। সকাল ৯টা বাজারও আধা ঘণ্টা আগে। এ কী দেখছি! বাইরে যত মানুষ, ভেতরে মনে হলো এর চেয়ে বেশি। পুরো আদালতে যেন সরষে ফেলার জায়গা নেই। বহুকষ্টে অর্ধেকটা কোর্ট কক্ষ ছাড়িয়ে মোটামুটিভাবে তৃতীয় সারির বেঞ্চের কাছে দাঁড়ালাম। ১৫ থেকে ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর তাকিয়ে দেখলাম পেছনের দিকে যত মানুষ, সবার মাঝেই একটা উৎকণ্ঠা, কারও মুখেই আনন্দ নেই। জমাদার এসে আদালত কক্ষে ঢুকতেই সবাই আগ্রহ নিয়ে সামনের দিকে তাকাল। আমার তো দু'হাত ঘেমে ভিজে যাচ্ছে, হাত-পায়ের তালু ঘামছে, কান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরই মাঝে প্রধান বিচারপতি সবার আগে ঢুকলেন। তাঁর পেছন পেছন ঢুকলেন বাকি বিচারপতিরা। সবার বসা শেষ হতেই প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমিন সামনের দিকে একটু তাকালেন, তারপর খাতা খুললেন মাইক্রোফোনটি কাছে নিয়ে ছোট্ট করে বললেন, আপিল ডিসমিস!

পুরো আদালত কক্ষে আলহামদুলিল্লাহ বলে একটি রব উঠে গেল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে এবং আমরা তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এলাম। কেউ কেউ বলছেন, এবার খুনিদের রক্ষা নেই। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। জনাকীর্ণ আদালত দেখে মনে হলো বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারটি যারা আটকে রেখেছিল, তারা আসলেই মূর্খের মতো কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো, তারপর কি না বিচার বন্ধ করে রাখার হীন প্রচেষ্টা! ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না বুঝতে পেরেছিলাম সেদিনই। আমার সাংবাদিকতা শুরুর দিকটা তারও ৬-৭ বছর আগে। তবে আদালত সাংবাদিকতার মাঝে যে টান অনুভব করেছি, সেটি মনে হয় কখনোই কাটবে না। সবচেয়ে গৌরবের কথাগুলো সুপ্রিমকোর্টের সাংবাদিকদের মধ্যে কমবেশি যাদেরই চিনতাম, তাদের সবার সঙ্গেই কখনো না কখনো এ হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে কথা হয়েছে। বিনা বাক্যে সবাই স্বীকার করেছে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় না এলে এ দেশে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি চালু হয়েছিল, এ ধারাবাহিকতায় মামলাটিও চিরকাল অন্ধকারেই থেকে যেত। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার এ দেশে আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠার একটি বড়ো মাইলফলক। একটি কথা বহুবার বহু সভা-সেমিনার কিংবা জনসভার ভাষণে বলতে শুনেছি; কিন্তু আদালতে, উচ্চ আদালতে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে দেখেছি–'বিচারের

আদালত সাংবাদিকতার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মামলার নথিতে কী চাওয়া হয়েছে এবং বাদী-বিবাদীদের আইনজীবীরা সে বিষয়টিকে আদালতের নজরে কী উপায়ে উপস্থাপন করেছে। কেননা আদালতে বিচারকাজ পরিচালিত হয় তথ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে

বাণী নিভৃতে কাঁদে' কথাটি শতভাগ সত্য। কত ধরনের ষড়যন্ত্র, কত ধরনের হুমকি, কত ধরনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে আইনজীবীরা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারকে এগিয়ে নিয়েছেন সঠিক গতিতে, তা খুব কাছ থেকে দেখার বিরল অভিজ্ঞতা হলো।

চার.

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা কাভার করার সময় যেটা দেখেছি, আইনবিষয়ক সাংবাদিকতার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সঠিক তথ্যের উপযুক্ত ব্যবহার। পরিষ্কার করে বললে বলতে হবে, বাদী-বিবাদীর শুনানিতে আদালতের যে পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকে, সেগুলো উপযুক্তভাবে অর্থাৎ কোনটি প্রচারযোগ্য, তা বিবেচনা করে রাষ্ট্র ও বিচারপ্রার্থীর স্বার্থ চিন্তা করে পরিবেশন করা অত্যন্ত জরুরি। আদালত সাংবাদিকতার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মামলার নথিতে কী চাওয়া হয়েছে এবং বাদী-বিবাদীদের আইনজীবীরা সে বিষয়টিকে আদালতের নজরে কী উপায়ে উপস্থাপন করেছে। কেননা আদালতে বিচারকাজ পরিচালিত হয় তথ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে। মামলার নথিতে যদি তথ্যপ্রমাণের ঘাটতি থাকে, শতচেষ্টা করেও সেই মামলায় সঠিক বিচার পাওয়া সম্ভব না। এটি আমরা দেখতে পেয়েছি বহু মামলায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাবে, মানবতাবিরোধী অপরাধী মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মামলায় দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে আদালত তার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণের ঘাটতির অভাবটি অনুভব করেছিলেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আদালতের কাছে পরিষ্কারভাবে এ হত্যা যে একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল, সেটি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। যে কারণে মামলার সঠিক বিচার পেতে কোনো ধরনের বেগ পেতে হয়নি দেশি-বিদেশি চাপ ও চক্রান্তের পরও। একই সঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, আইনের বিভিন্ন শাখায় মানবাধিকারের বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকায় আইন সাংবাদিকতা সহজ হয়েছে। যে কোনো মামলার ফাইলপত্র দেখে আদালতের আদেশের পর সেই মামলা সম্পর্কে সংবাদ তৈরি করতে গেলে যে কোনো প্রতিবেদককে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। তাই আমি মনে করি, আইন সাংবাদিকতা করতে হলে অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে যে বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করবেন, সেই বিষয়ের অথবা সেই মামলাটির নথিটিকে যদি সম্ভব হয় নিজে দেখে নেওয়া অথবা বাদী-বিবাদীর আইনজীবীর কাছ থেকে বিষয়টির সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা। উচ্চ আদালতে সাংবাদিকতা করতে এসে প্রথম দিন থেকে আমি যেটি দেখেছি, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সঠিক সময়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য উভয় পক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে মামলা নিয়ে আলোচনা করাটা গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, ১৫ বছরের বেশি সময় আইন সাংবাদিকতা করতে এসে ড. কামাল হোসেন, ড. এম জহির, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, অ্যাডভোকেট আব্দুল বাসেত মজুমদার কিংবা টিএইচ খান স্যারদের কথাই বলা যায়। কখনো কোনো আইনজীবীর কাছ থেকে তথ্য পেতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। বিনয়ের সঙ্গে যখন যে মামলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি, সময় নিয়ে নথি দেখে তথ্য দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় আইনজীবীরা। বলে রাখা প্রয়োজন, সুপ্রিমকোর্টে আমাদের সময় অর্থাৎ ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, তাহের হত্যা মামলা, যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনালে গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মো. মুজাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, কামারুজ্জামান, কাদের মোল্লা, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংবাদ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে দেখেছি নথি দেখে আদালতের শুনানিতে উপস্থিত থাকলে সংবাদ তৈরি করতে কখনোই কোনো ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। বলে রাখা প্রয়োজন, আমি আমার সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে রাত ১১টার পরও ফোন করে তথ্য নিতে পেরেছি সংবাদ তৈরির প্রয়োজনে। একটা দীর্ঘ সময় অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল থাকায় গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো সঠিক সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা অত্যন্ত সহযোগিতা পেয়েছেন। জীবনগল্পের কি শেষ আছে? সময়ের অনেক শ্রদ্ধাভাজনই আজ আর নেই।

মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আদালত চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে সেসব দিনের কথা খুব মনে পড়ে।

লেখক: সভাপতি, ল রিপোর্টার্স ফোরাম

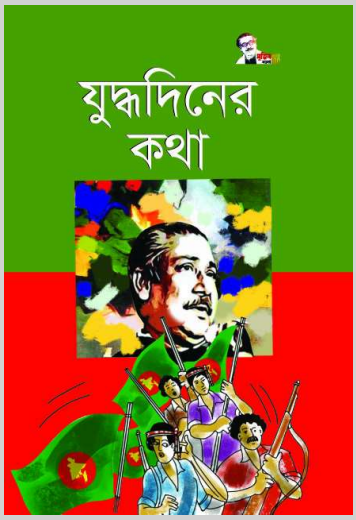

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

আইন ও বিচারালয় সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় নীতিমালা

■ মো. মিনহাজ উদ্দীন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবরেণ্য সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এবিএম মূসা ও ফয়েজ আহমদকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁদের ডাকতেন আপদ-বিপদ-মুসিবত নামে। বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য এই তিন সাংবাদিকের মধ্যে ফয়েজ আহমদকে তিনি ডাকতেন আপদ নামে। গুণী সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ মধ্যরাতের অশ্বারোহী নামের কালজয়ী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে একজন কালের সাক্ষী হিসাবে ফয়েজ আহমদ সাংবাদিকতার নানা দিক তুলে ধরেছেন। উঠে এসেছে খবর, খবরের পেছনের খবর, গল্প, স্মৃতিচারণা এবং সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা নিয়ে নানা আলোচনা।

মধ্যরাতের অশ্বারোহীতে 'সত্যবাবু মারা গেছেন' নামের একটি অধ্যায় লিখেছেন ফয়েজ আহমদ। যাতে উঠে এসেছে সংবাদের নীতি-নৈতিকতা ও সংবেদনশীলতার বিষয় নিয়ে কয়েকটি সত্য ঘটনা। এর মধ্যে একটি ঘটনা অপরাধকেন্দ্রিক। যাতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন বরিশাল শহরের সাব জজ মি. সান্যাল। ফয়েজ আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল ১৯৬৯ সালের। এ সময় যশোর সীমান্তে কিছু স্বর্ণালংকারসহ এক সম্ভ্রান্ত নারী আটক হন। অভিযোগ চোরাচালান। শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা না দিয়ে কিছু স্বর্ণালংকার ও টাকা তিনি ভারতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে আটক করা হয়। পরে জানা যায়, এই ভদ্রমহিলা একজন জেলা সাব জজের স্ত্রী। আর তাই বিষয়টিতে নিজেদের কৃতিত্ব আর পেশাদারি জাহির করতে এই সংবাদটি শুল্ক কর্মকর্তারা আগ্রহ সহকারে সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরদিন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে বড়ো আকারে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। বরিশালের সাব জজ মি. সান্যাল ছিলেন একজন সংবেদনশীল, নিষ্ঠাবান ও সৎ বিচারক। আদালত অঙ্গনে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে

তিনি তাঁর পেশাদারি বজায় রেখে চলছিলেন। যার জন্য সবার কাছেই তিনি সম্মানিত ছিলেন। দেশের মূলধারার সংবাদপত্রে ওই চোরাচালানের খবরের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন সাব জজ সান্যাল। ঢাকা থেকে বরিশাল শহরে আসা সেই সংবাদপত্র পড়েই তিনি পরদিন কোর্টে যান। সারা দিন ছিলেন বিমর্ষ। দিনের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় সহকর্মীকে বলে যান, 'সমস্ত বিচার বিভাগের সততার ওপর কলঙ্ক এসে পড়েছে। যেজন্য মানুষ বাঁচে, তাই আমি হারিয়েছি। কলঙ্কময় এ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ নেই।'

পরদিন সকালে একটি খবর পুরো বরিশালবাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়। সাব জজ মি. সান্যাল আত্মহত্যা করেছেন। আর চিরকুটে লিখে গেছেন, 'এ লজ্জার কলঙ্কময় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ নেই। মানুষ যা নিয়ে বেঁচে থাকে, তাই আমি হারিয়েছি।'

আইন ও বিচারালয় সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় এই বেদনাদায়ক গল্পটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের সবার মনে রাখা প্রয়োজন, সাংবাদিকতা খুবই সংবেদনশীল একটি পেশা। আর আইন ও বিচারালয় সংক্রান্ত সাংবাদিকতা আরও সংবেদনশীল। এখানে আইন, বিচারের প্রক্রিয়া যেমন সংবেদনশীলতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হয় একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে কারও যাতে অযথা মানহানি করা না হয়।

আইন-বিচার সংক্রান্ত সাংবাদিকতা: কী আছে প্রেস কাউন্সিল আচরণবিধিতে

বাংলাদেশে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার উৎকর্ষকেন্দ্রিক বেশকিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলো সাংবাদিকতার জন্য কখনোই কোনো যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করেনি। শুধু বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এ বিষয়ে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে ১৯৯৩ সালে, যা সংশোধিত হয় ২০০২ সালে। অর্থাৎ গত দুই দশকে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা আমূল পরিবর্তিত হলেও এ বিষয়ে কোনো নীতিমালা নতুন করে প্রণীত হয়নি বা পুরোনো নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়নি।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত 'প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি' শিরোনামের ওই নীতিমালার কিছু বিষয় আইন ও বিচারালয় সংক্রান্ত সাংবাদিকতার নীতিমালার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়গুলো ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা হলো:

বর্তমানে প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত 'প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধির ২৫টি ধারা রয়েছে। যার ১৬তম ধারাটি আইন ও বিচারালয় সংক্রান্ত সাংবাদিকতা সম্পর্কিত। যাতে বলা হয়েছে,

> *'কোন অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলাবিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কোন মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত সাংবাদিককে বিরত থাকা; (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি ১৯৯৩, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট)*

এ নীতিমালাটি ব্যাখ্যা করে আমরা বলতে পারি, কোনো অপরাধের বিচারাধীন খবর প্রকাশ করা সাংবাদিকের দায়িত্ব। অর্থাৎ একজন সাংবাদিক তাঁর দায়িত্ব পালনের নীতিমালার ভিত্তিতেই চলমান বিচারাধীন মামলার খবর প্রকাশ করবেন। এক্ষেত্রে ওই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চেপে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমন: বাংলাদেশের ইতিহাসে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ বিচার প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি সাংবাদিকরা কাভার করেছেন, যা ছিল যথাযথ। আবার সাংবাদিকতার মাধ্যমে এ বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করারও একটা প্রচেষ্টা ছিল। বিশেষ করে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসি কার্যকর হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর (সাকা চৌধুরী) পরিবারের সদস্যরা এ বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে নানা ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে গেছেন। গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, যা পরিহার করাও ছিল সাংবাদিকের দায়িত্ব। বাংলাদেশের বেশির ভাগ গণমাধ্যম বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও কিছু গণমাধ্যম এ বিচারকাজকে বানচাল করার জন্য নানা ধরনের অপসাংবাদিকতা বা উসকানিমূলক সাংবাদিকতা করে গেছে। যার অন্যতম মাহমুদুর রহমানের দৈনিক আমার দেশ।

সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

এই নিবন্ধের লেখকের বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের নানা বিচারিক কার্যক্রম খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। একই সঙ্গে লেখক মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুন্যালের বিচারিক কার্যক্রমও সাংবাদিক হিসাবে কাভার করেছেন। সংবাদ সংগ্রহ করেছেন নিম্ন আদালত ও জজকোর্টে। প্রায় আট বছরের সাংবাদিক ক্যারিয়ারে আদালত অঙ্গনে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ও একাডেমিক গ্রন্থ 'The Complete Reporter'-এর ভিত্তিতে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

* **আদালত অঙ্গনে রেকর্ড যন্ত্র ব্যবহার ও সম্প্রচার:** আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশের যুগে ছবি, শব্দ-ভিডিয়ো ধারণ এবং সরাসরি সম্প্রচার অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও কোনো ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করা সম্ভব। এ বাস্তবতায় মনে রাখা প্রয়োজন, আদালত কক্ষ একটি সংরক্ষিত জায়গা। এখানে বিভিন্ন ধরনের রেকর্ড যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। আর সরাসরি সম্প্রচার তো নিষিদ্ধই। তবে উন্নত বিশ্বে কিছু কিছু আদালতের কার্যক্রম বিচারকের অনুমতি সাপেক্ষ সরাসরি সম্প্রচার করা যায়। এক্ষেত্রে বিচারক বা বিচারকদের আলাদা আদেশের প্রয়োজন হয়। যেমন: ২০২২ সালে হলিউড অভিনেতা জনি ডেপ ও অভিনেত্রী আম্বার হার্ডের মানহানির মামলার বিচারিক কার্যক্রম বিভিন্ন টিভিতে লাইভ সম্প্রচার হয়েছিল। এক্ষেত্রে সাতজন বিচারকের একটি আদেশ ছিল।

* **চিত্রধারণ:** সাংবাদিকতায় ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় নানা ধরনের ছবি প্রকাশিত হয়। তবে আদালত কক্ষের ছবি তোলা ও প্রকাশ সম্পূর্ণ আইনবিরোধী। কারণ, আদালতের ভেতরে শুনানি চলাকালে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর মধ্যে নানা ধরনের আলোচনা হয়। সওয়ালজবাব প্রক্রিয়া চলে। বলা যায়, এক কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়। এ কর্মকাণ্ডের ছবি তোলা নিষিদ্ধ। তবে ছবি আঁকা ও তা প্রকাশ বৈধ। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল এক অভিযোগের ভিত্তিতে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের গ্র্যান্ড জুরি আদালতে হাজিরা দেন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অনেক বড়ো ঘটনা ছিল। এ ঘটনায় এবিসি নিউজ অনেক বড়ো করে সংবাদ প্রকাশ করে। যাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্কেচ ছবি প্রকাশিত হয়। যাকে সাংবাদিকতা ভাষায় বলা হয় কোর্টরুম স্কেচ (Courtroom sketch).

Former US President Donald Trump appears in court for an arraignment on charges stemming from his indictment by a Manhattan grand jury in this courtroom sketch, Apr. 4, 2023 in New York.

* **রায়ের অংশ চুরি বা ফাঁসের তথ্য-উপাত্ত প্রচার-প্রকাশ:** মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাকা চৌধুরীকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। তবে রায়ের আগেই সাকা চৌধুরীর স্ত্রী ও তার পরিবারের সদস্য এবং আইনজীবীরা রায় ফাঁসের অভিযোগ তোলেন। তারা 'রায়ের খসড়া কপি' সাংবাদিকদের দেখান এবং স্পাইরাল বাইন্ডিং করা কপি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের এজলাস কক্ষে প্রবেশ করেন। এ দিন এটিএন বাংলায় জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ওইদিন লেখক আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন এবং আদালত কার্যক্রম শুরুর আগে সাকা চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে ফাঁস হওয়া রায়ের অংশ দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল খুবই স্পর্শকাতর একটি ঘটনা। সাকা চৌধুরীর পরিবার চাচ্ছিল যাতে এই সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ-সম্প্রচার করা হয়। কিন্তু কোনো গণমাধ্যম সেই কাজ করেনি। কেননা, মামলার রায়ের অংশ চুরি এবং তা প্রচার-প্রকাশ করা আইনসম্মত নয়।

সাংবাদিক জওয়াদুর রহমানের মতামত

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে জওয়াদুর রহমান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান (পরে দৈনিক বাংলা)-সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি সাংবাদিকতার নীতিমালা নিয়ে বিশেষ একটি আলোচনা করেছেন, যা প্রকাশ হয়েছে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত 'সাংবাদিকতা' গ্রন্থে। এতে আইন-আদালত সংক্রান্ত সাংবাদিকতা নিয়ে দুটি নীতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন,

* আদালত অবমাননা করা চলবে না।
* আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা চলবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হবে আদালতে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নয়।

জওয়াদুর রহমানের মতামত খুবই প্রাসঙ্গিক। আদালত রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি অঙ্গ, যা পরিচালিত উচ্চ নৈতিকতা, নীতি ও বিধির ভিত্তিতে। আর এ কারণেই আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ আদেশ অমান্য করা যাবে না। হ্যাঁ, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় নতুন করে আবেদন (আপিল) করা যাবে।

তথ্যসূত্র

- সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি, http://www.press-council.gov.bd/ file:///C:/Users/Hp/Desktop/Code%20of%20Conduct-pdf%20(1).pdf (পুনরায় দেখা; ৭ ডিসেম্বর ২০২২)
- মূসা, এবিএম (২০১২), *মুজিব ভাই*, প্রথমা: ঢাকা।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

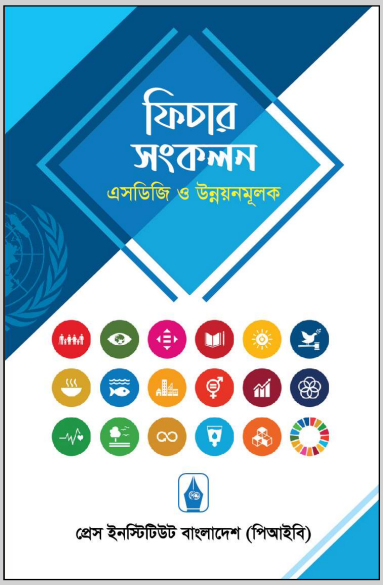

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাইবার পরিসরে সাংবাদিকতা

চিন্তার স্বাধীনতা বনাম আইনি সতর্কতা

■ শুভ কর্মকার

'সাইবার পরিসর' বলতে বোঝায় মানুষের অস্তিত্বের ইন্টারনেটনির্ভর সাংকেতিক উপস্থাপন। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কল্পিত সমাজের উপস্থাপক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শুরুতে 'বিকল্প মাধ্যম' হিসাবে অভিহিত হয়। মূলধারার গণমাধ্যমে যা বলা যায় না, সেটা বলা যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এছাড়াও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সাইবার পরিসরনির্ভর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে জুড়ি নেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের। 'আরব বসন্তের' গণজোয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তৃতি, ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে ঝুঁকি। ঘটছে সাইবার পরিসরনির্ভর নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও। বিকল্প মাধ্যম হিসাবে পরিচিতি পাওয়া 'শুরুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম' এবং 'বর্তমানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম'-এর মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বৃদ্ধির সঙ্গে সেটা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হয়েছে আইন ও বিধি।

ফেসবুকে নগ্ন ছবি-ভিডিয়ো প্রচার, নারী সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করা, স্পর্শকাতর বিষয়ে অপপ্রচার করা, কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রকাশ করে কাউকে হেনস্তা করা, সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো, ঘৃণা, বিদ্বেষ, গুজব ছড়ানো, মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন দলগুলো একে অপরকে হেয়প্রতিপন্ন করে, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল, বানোয়াট, মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তৈরি হচ্ছে (হোসেন, ২০২১)

ফলে বিকল্প মাধ্যমে 'চিন্তার স্বাধীনতা'-এর ধারণা অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কতিপয় অশুভ চক্রের হীন উদ্দেশ্যসাধনে। বিকল্প মাধ্যমের মৌলিক চেতনা আজ হুমকির সম্মুখীন। এজন্য জনগণের কল্যাণে এবং সমাজে শৃঙ্খলা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তৃতি, ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে ঝুঁকি। ঘটছে সাইবার পরিসরনির্ভর নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও। বিকল্প মাধ্যম হিসাবে পরিচিতি পাওয়া 'শুরুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম' এবং 'বর্তমানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম'-এর মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বৃদ্ধির সঙ্গে সেটা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হয়েছে আইন ও বিধি

প্রতিষ্ঠায় তৈরি হয়েছে সাইবার পরিসরনির্ভর নানাবিধ আইন। সাইবার পরিসরের এই পরিবর্তন সম্পর্কে অবশ্যই অবগত থাকতে হয় একজন সাংবাদিককে। তিনি তথ্য নিয়ে কাজ করেন, তথ্য সাইবার পরিসরে প্রচার করেন, এমনকি তথ্য সাইবার পরিসর থেকে সংগ্রহও করেন। তাই সাইবার পরিসরের প্রাযুক্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি সাইবার পরিসর সম্পর্কিত আইন সম্পর্কেও দক্ষ সাংবাদিককে অবগত থাকতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সাইবার পরিসরনির্ভর সাংবাদিকতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং আইনি সতর্কতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চিন্তার স্বাধীনতা বনাম আইনি সতর্কতা

সাংবাদিকতার সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করা হলেও গোড়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যায়। চিন্তাই যদি করা না যায়, তাহলে সেই চিন্তা কীভাবে প্রকাশ করা হবে? রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক পারিপার্শ্বিকতা এবং জ্ঞানের সহজলভ্যতার মধ্য দিয়ে চিন্তার স্বাধীনতা তৈরি হয়। চিন্তার স্বাধীনতা হলো আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিকসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে ব্রেইনস্ট্রমিং করা এবং সেই চিন্তালব্ধ জ্ঞান প্রকাশ করা। 'অ্যা হিস্ট্রি অব ফ্রিডম অব থট' গ্রন্থে কেমব্রিজ ইতিহাসবিদ জে. বি. বিউরি উল্লেখ করেন, 'যে কোনো মূল্যবহ অর্থে চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যে বাক্‌স্বাধীনতাও রয়েছে।' যেভাবেই বলি না কেন, মানুষের চিন্তা করতে কোনো বাধা নেই। চিন্তা অবাধ। আমরা আনমনে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে পারি। আর চিন্তা করতে মানুষকে বাধা দেওয়া যায় না। তখনই বাধা দেওয়া যায়, যখন মানুষের এই চিন্তা অন্যকে জানানো হয়। মূলত চিন্তা করার এ স্বাধীনতা প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক এ স্বাধীনতা অত্যন্ত মূল্যহীন, যদি চিন্তাভাবনাগুলো অপরকে না জানানো যায়, তবে সেই চিন্তার কোনো মূল্যই থাকে না। এছাড়া যিনি চিন্তা করছেন, তার এ না জানানোটাও একধরনের অস্বস্তির, অতুষ্টিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। সবচেয়ে বড়ো বিষয়, মানুষের মনের ওপর যেসব চিন্তার প্রভাব আছে, সেগুলো লুকিয়ে রাখা অনেক কঠিন। (বিউরি, ২০০৭)

কিন্তু ক্ষমতার দ্বারা যদি 'চিন্তা' শব্দটিকে আবদ্ধ করে ফেলা হয়, তাহলে? মিশেল ফুকোর ক্ষমতা প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনা না করলেই নয়। মিশেল ফুকো ক্ষমতা বলতে তিনটি বিষয়কে বুঝিয়েছেন। এক. সার্বভৌমত্ব বা সভারেনটি; দুই. অনুশাসন বা ডিসিপ্লিন; তিন. প্রশাসনিকতা বা গভর্নমেন্টালিটি। সার্বভৌমত্ব বলতে মিশেল ফুকো সনাতনী পদ্ধতির রাষ্ট্রক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। যেখানে রাজা বা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো রাষ্ট্রপ্রধান নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান প্রকাশ হলো আইন প্রণয়ন করা, সেই আইন প্রয়োগ করা, আইন লঙ্ঘিত হলে লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেওয়া। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ফুকোর এ সার্বভৌমত্বকে দণ্ড হিসাবে অভিহিত করেছেন। সমাজে বসবাস করার সময় আমরা দণ্ডকে ভয় পাই। ফলে আইন অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে থাকি। ক্ষমতা সম্পর্কে ফুকোর দ্বিতীয় ধারণাটি অনুশাসন। অনুশাসনের ধারণাটি শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, কাজ করে মানুষের চেতনায়। অনুশাসন মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে স্বশাসনে যেতে সাহায্য করে। ফুকো অনুশাসন বলতে হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়েছেন। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, কারাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। ফলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে মানুষ স্বাগত জানায়। ফুকো বলেছেন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে মানুষকে নজরবন্দি করার জন্য। অসুস্থ মানুষের শারীরিক কার্যক্রম কেমন চলছে, সেটা নজরবন্দি রাখা হয় হাসপাতালে। আইনভঙ্গকারীকে নজরবন্দি রাখা হয় কারাগারে। ছাত্রকে নজরবন্দি রাখা হয় বিদ্যালয়ে। এভাবে নজরবন্দি করতে পারলে তবেই একে অনুশাসনবদ্ধ করা যায়। এতে বল প্রয়োগের প্রয়োজন নেই, মানুষের চেতনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে অনুশাসন। তাই বলা হয়, আধুনিক সমাজে ক্ষমতার ধারণাটি ভিন্ন। এখানে ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রক্ষমতায় সীমিত নয়। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতার আদর্শ সার্বভৌমত্ব নয়, বরং কেন্দ্রহীন সর্বব্যাপী এক অনুশাসনতন্ত্র। ক্ষমতা বিষয়ে ফুকোর তৃতীয় ধারণাটি হলো প্রশাসনিকতা বা গভর্নমেন্টালিটি। এ ধারণায় ফুকো বলেছেন, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগণের কল্যাণের জন্য। জনগণের কল্যাণ হলো কোনো সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, বরং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ কল্যাণের জন্য। এ কল্যাণের প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হয় নানা তথ্য-উপাত্ত। তথ্য ও উপাত্তের সমন্বয়ে জনগোষ্ঠীর একেকটি অংশের ব্যবহার, প্রবণতা, চাহিদা প্রভৃতি যাচাই করে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বল প্রয়োগের প্রয়োজন নেই; শুধু উৎসাহ কিংবা আর্থিক সুবিধা দিলেই ক্ষমতার চর্চা করা যায়। আবার বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে এক বাসস্থান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা প্রয়োজন। প্রশাসনিকতায় গায়ের জোর না খাটিয়ে আর্থিক উৎসাহ দেওয়া বা আর্থিক অন্তরায় সৃষ্টি করে ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকে। (চট্টোপাধ্যায়, ২০০০)

ক্ষমতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিষয়ে উল্লিখিত ধারণায় বৈপরীত্যমূলক অবস্থান রয়েছে। সাইবার পরিসর চিন্তার স্বাধীনতার ধারণাকে বাস্তবায়িত করেছে। ব্লগে লেখালেখির মাধ্যমে অন্তরে ঘটে যাওয়া চিন্তার বহিঃপ্রকাশ করা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষত ফেসবুকে কোনো ঘটনা সম্পর্কে লেখা যায়, মন্তব্য করা যায়। লেখালেখির ক্ষেত্রে আগে শুধু লেখক, সাংবাদিক লিখতেন। বর্তমানে দৃশ্যপট পালটে গেছে। সাইবার পরিসরের কল্যাণে সহাবস্থান তৈরি হয়েছে। চায়ের স্টলের আড্ডার কথোপকথন এখন চলে এসেছে সাইবার পরিসরে। ফলে অপরিপক্ব-আনসেন্সরড কথোপকথন সাইবার পরিসরে লক্ষ করা যায়। সামাজিক কল্যাণের পরিবর্তে এ ধরনের কথোপকথন অনেক সময় সমাজের জন্য হুমকি ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব হুমকি ও ক্ষতি রোধ করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাগুলো আইন-বিধি তৈরি করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সাইবার পরিসরের কর্মকাণ্ড ও বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন সম্পর্কে সাংবাদিকের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাংবাদিকতায় চিন্তার স্বাধীনতা বনাম আইনি সতর্কতা: প্রেক্ষিত সাইবার পরিসর

'নিরীক্ষা' ২১৭তম সংখ্যার 'সাইবারস্পেস ও সাংবাদিকতা' শীর্ষক লেখায় সাইবারস্পেস ও সাংবাদিকতাবিষয়ক আলোচনা তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত. সংবাদ উৎস হিসাবে সাইবারস্পেস, দ্বিতীয়ত. সাইবারস্পেসভিত্তিক সাংবাদিকতা, তৃতীয়ত. সাংবাদিকের সাইবার নিরাপত্তা (কর্মকার, ২০১৮)। এ তিনটির মধ্যে সংবাদ উৎস ও সাইবারস্পেসভিত্তিক সাংবাদিকতা সাইবার পরিসরনির্ভর আইনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি সাংবাদিকের প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার সঙ্গে জড়িত। সাইবার পরিসরে কোনো তথ্য প্রচার, তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত মতামত প্রচারের ক্ষেত্রেও একজন সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা নিজের অজান্তেই একজন সাংবাদিক অপরাধ ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। সাইবার পরিসর ও সাংবাদিকতাসংশ্লিষ্ট যেসব আইন বা আইনের ধারা বাংলাদেশে বিদ্যমান, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন বা ধারাগুলো এখানে উপস্থাপন করা হলো:

১. সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ সংক্রান্ত সতর্কতা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৬১ ধারায় সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রক, সরকারি বা ঐচ্ছিকভাবে ইলেকট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে একটি সংরক্ষিত সিস্টেম হিসাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি ওই সংরক্ষিত কম্পিউটার, সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করে, তবে এ অননুমোদিত প্রবেশ একটি অপরাধ। এ অপরাধের জন্য ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান থাকলেও ২০১৩ সালের সংশোধিত আইনে ১০ বছরের কারাদণ্ড, অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান করা হয়।

সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-এর ১৭(১) ধারার (ক)-তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে বেআইনি প্রবেশ, (খ)-তে বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট বা অকার্যকর করে অথবা চেষ্টা করে তবে সেটা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। ১৭ ধারার ২(ক)-তে বলা হয়েছে, ১৭ ধারার ১-এর (ক) মোতাবেক বেআইনি প্রবেশ করলে দণ্ড হিসাবে অনধিক ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ১৭ ধারার ১-এর (খ) মোতাবেক অপরাধের দণ্ড হিসাবে অনধিক ৬ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

এ আইনের ১৮ ধারায় কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদিতে বেআইনি প্রবেশকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ১৮ ধারার ১-এর (ক)-তে কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বেআইনি প্রবেশ বা প্রবেশ করতে সহায়তা করেন তাহলে ২(ক) মোতাবেক এ ধরনের অপরাধের জন্য অনধিক ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লাখ টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ১৮ ধারার ১(খ)-তে বলা হয়েছে, কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বেআইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করতে সহায়তা করেন, তাহলে ২(খ) মোতাবেক অনধিক ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

উল্লিখিত আইন ও আইনের ধারাগুলো সম্পর্কে সাংবাদিককে সজাগ থাকতে হবে। তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্য কারও কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস কিংবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে প্রবেশের কারণে সাংবাদিক অপরাধ সংঘটিত করতে পারেন। এজন্য আইন অনুযায়ী দণ্ডিতও হতে পারেন। তাই সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হবে।

২. গোপনীয়তা প্রকাশ সংক্রান্ত সতর্কতা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৬৩ ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধানের অধীন কোনো ইলেকট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তুতে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে, কোনো ইলেকট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।' এ ধারায় অপরাধ সংঘটিত করলে অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। সাংবাদিক যেহেতু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় গোপনে তথ্য সংগ্রহ করেন, সেহেতু এ বিষয়ে তাঁকে অধিকতর সতর্ক থাকতে হবে।

৩. নিষিদ্ধ সত্তার তথ্য প্রচার বিষয়ে সতর্কতা

সাংবাদিক গোপন বিষয়ের প্রচার করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আইন না জানার কারণে তিনি অনবধানতাবশত অপরাধ সংঘটিত করে ফেলতে পারেন। ২০০৯ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাশ হয়। এ আইনের ৯ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ সত্তার (ব্যক্তি বা সংগঠন) জন্য সমর্থন চাহিয়া অথবা উহার কর্মকাণ্ডকে সক্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে কোনো সভায় বক্তৃতা করেন অথবা রেডিও, টেলিভিশন অথবা কোনো মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোনো তথ্য সম্প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।' আইনে এ অপরাধের জন্য অনধিক সাত বছর ও অন্যূন দুই বছর যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকার বা আন্তর্জাতিকভাবে

সাইবার পরিসরের এই পরিবর্তন সম্পর্কে অবশ্যই অবগত থাকতে হয় একজন সাংবাদিককে। তিনি তথ্য নিয়ে কাজ করেন, তথ্য সাইবার পরিসরে প্রচার করেন, এমনকি তথ্য সাইবার পরিসর থেকে সংগ্রহও করেন। তাই সাইবার পরিসরের প্রাযুক্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি সাইবার পরিসর সম্পর্কিত আইন সম্পর্কেও দক্ষ সাংবাদিককে অবগত থাকতে হয়

নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠনের তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে সাংবাদিককে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। নিষিদ্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংবাদ প্রচার যেন কোনোভাবেই তাদের (নিষিদ্ধদের) সমর্থনে না যায়, এ বিষয়ে অবশ্যই সাংবাদিককে সজাগ থাকতে হবে।

৪. পর্নোগ্রাফি বিষয়ে সতর্কতা

পর্নোগ্রাফি সামাজিকভাবে মানুষকে হেয়প্রতিপন্ন করে। পর্নোগ্রাফি সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ রয়েছে। এ আইনের ৮ ধারায় বলা আছে, পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, উৎপাদনের জন্য অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ, এ সংক্রান্ত চুক্তি করা, নারী/পুরুষ/শিশুকে অংশগ্রহণে বাধ্য করা, প্রলোভন দেখানো এবং তাদের জানা বা অজানায় ভিডিয়ো ধারণ করলে সেটা অপরাধ। আর এ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। সাংবাদিক তথ্য সংগ্রহ করেন। সমাজে এ ধরনের অপরাধ প্রায়ই ঘটে। সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করে বস্তুনিষ্ঠভাবে আইনের দ্বারা ঘটনাকে উপস্থাপন করাই সাংবাদিকের কাজ। এ ধরনের ঘটনাসংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের সময় সাংবাদিক অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

উল্লিখিত আইনের ৮(২) ধারায় বলা আছে, কোনো ব্যক্তির জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধারণকৃত কোনো পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তির মর্যাদা হানি করলে বা ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায় বা অন্য কোনো সুবিধা আদায় বা মানসিক নির্যাতন করলে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড এবং দুই লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতে পারে। ফলে এ ধরনের ঘটনায় যার পর্নোগ্রাফি বেড়িয়েছে, সেই দিকে নজর না দিয়ে অপরাধীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সাংবাদিক আইনের সহায়ক হিসাবে কাজ করতে পারবেন। সাংবাদিক এ বিষয়ে সংবাদ প্রচারের সময় শব্দলিখন ও উচ্চারণে সতর্ক থাকবেন।

পর্নোগ্রাফির কোনো ঘটনায় সাংবাদিকের কাছে একটি পর্নো ভিডিয়ো এসে পৌঁছাল। তিনি অত্যুৎসাহী হয়ে সেই ভিডিয়ো অন্য কোনো ব্যক্তির মাঝে বা সহকর্মীর মাঝে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সরবরাহ করলেন এবং অবহিত করলেন। এ ঘটনায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(৩) ধারায় ওই সাংবাদিক অপরাধ সংঘটিত করেছেন। এজন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। এ ধারায় বলা আছে, কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করলে অপরাধ সংঘটিত হবে।

৫. শিশুর স্বার্থপরিপন্থি কোনো বিষয় প্রচারে সতর্কতা

বিচারাধীন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক সংবাদই প্রকাশিত হয়। তবে শিশুবিষয়ক মামলা সম্পর্কে কোনো সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিককে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। শিশু আইন ২০০৩-এর ১৮ ধারায় বলা আছে, এ আইনের অধীন বিচারাধীন কোনো মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো শিশুর স্বার্থের পরিপন্থি এমন কোনো প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, যার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়। যদি এ ধরনের কোনো কাজ করা হয় তবে এ অপরাধের জন্য অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান হয়েছে।

৬. মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বিদ্বেষ, বিভ্রান্তি, কুৎসা প্রচার সম্পর্কে সতর্কতা

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর ২১ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বিদ্বেষ, বিভ্রান্তি, কুৎসামূলক প্রচারণা চালায় বা মদত দেয়, তাহলে তা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এ অপরাধের জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৭. ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত সম্পর্কে সতর্কতা

ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এরকম তথ্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করাকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৮ ধারায়। এ ধরনের অপরাধের জন্য অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ লাখ টাকা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই, সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে সাংবাদিককে অবশ্যই এটি মেনে চলতে হবে। এমন কোনো তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা যাবে না, যেটা অন্য কোনো ধর্মানুসারীর মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৮. মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার সম্পর্কে সতর্কতা

১৮৯৮ সালের ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের একবিংশ পরিচ্ছেদ মানহানিবিষয়ক। দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪৯৯ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বা তাঁর খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হবে বলে জানা সত্ত্বেও বা তাঁর বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারিত বা পঠিত হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট কথা দ্বারা বা চিহ্ন দ্বারা দৃশ্যমান বস্তু বা প্রতীক দ্বারা সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো ঘটনা আরোপ করে বা প্রকাশ করে, তাহলে সে ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে ধরা হয়। তবে এখানে মৃত ব্যক্তি, কোম্পানি, শ্লেষাত্মক, চরিত্র বা নৈতিক দিক থেকে হেয় করার বিষয়ে বেশকিছু ব্যতিক্রমের উপস্থাপনা করা হয়েছে। সাইবার পরিসরে মানহানির বিষয়েও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-এর ২৯ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারা মোতাবেক মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করে তবে সেটা অপরাধ হবে। আর এ অপরাধের জন্য সাইবার নিরাপত্তা আইনে অনধিক ২৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

৯. অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা

সাংবাদিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। যাঁর পরিচিতি তথ্য নেওয়া হচ্ছে তাঁর অনুমতি ছাড়া যদি সেই তথ্য প্রচার বা ব্যবহার বা বিক্রি করা হয় তবে সেটা অপরাধ। এ সম্পর্কে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৬ ধারায় এটিকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাংবাদিককে সতর্ক থাকতে হবে। পরিচিতি তথ্য বলতে বাহ্যিক, জৈবিক বা শারীরিক, অন্য কোনো তথ্য যা এককভাবে বা যৌথভাবে একজন ব্যক্তি বা সিস্টেমকে শনাক্ত করা যায়, নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নম্বর, ফিঙ্গার প্রিন্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ই-টিআইএন নম্বর, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর, ব্যবহারকারীর নাম, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড নম্বর, ভয়েজ প্রিন্ট, রেটিনা ইমেজ, আইরেস ইমেজ, ডিএনএ প্রোফাইল, নিরাপত্তামূলক প্রশ্ন বা অন্য কোনো পরিচিতি যা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্য সহজলভ্য। এ ধরনের তথ্য আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়া সংগ্রহ, বিক্রয়, দখল, সরবরাহ বা ব্যবহার করলে অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সাংবাদিককে জনগণের কল্যাণে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সংবাদের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার করে যেতে হবে। সাইবার পরিসরের ব্যাপ্তি সাংবাদিকদের সতর্কতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানের পাশাপাশি বর্তমানে সাইবার পরিসর সম্পর্কিত আইনের জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র

১. কর্মকার, শুভ। (২০১৮)। সাইবার পরিসরে সাংবাদিকতা। নিরীক্ষা, ২১৭তম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮, পৃ. ১৩-১৫।

২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। (২০০০)। ইতিহাসের উত্তরাধিকার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. বিউরি, জে. বি.। (২০০৭)। চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস (প্রতিমা মিত্র, অনুবাদ)। বাংলা একাডেমি।

৪. হোসেন, মো. জাকির। (২০২১, জুন ১৩)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন অপরাধেরও মাধ্যম। কালের কণ্ঠ। https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2021/06/12/1042506

***লেখক:** প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)*

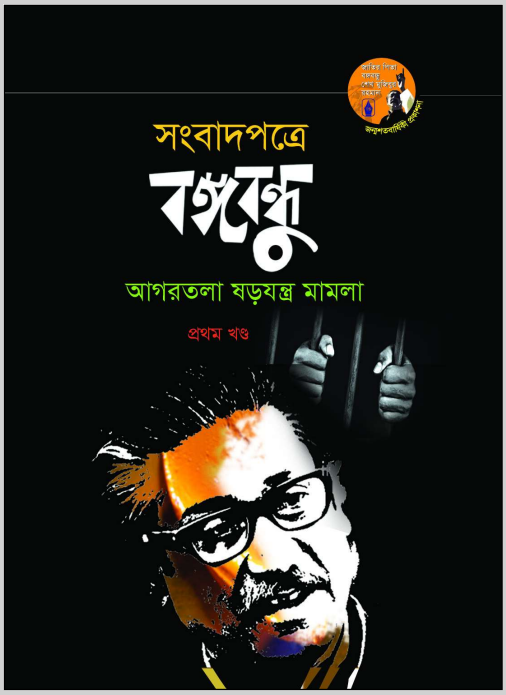

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যমে বিদ্যমান আইন এবং সাংবাদিকের করণীয়

■ আবুজার

প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে গণমাধ্যম আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষের জীবনযাপন, তথ্যের আদান-প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকার পরিচালনা, ব্যাবসাবাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম হলো গণমাধ্যম (রশীদ, ২০২৩)। আবার লেখা, চিত্র, শব্দ ও ইন্টারঅ্যাকটিভিটি সহযোগে ইন্টারনেটে তথ্য-উপাত্তকে এমনভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব; যা গণমাধ্যমের কোনো মাধ্যমেই তেমনটা সম্ভব নয়। এটি হতে পারে খবরের কাগজ, ব্যক্তিগত ডায়ারি বা সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলো। বর্তমানে ইন্টারঅ্যাকটিভিটিসহ বিভিন্ন ধরনের নিউজ পোর্টাল, নিউজ ব্লগ, আইপি টিভি, ইন্টারনেট রেডিয়ো প্রভৃতি নানা ধরনের অনলাইন গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটেছে। দেশে বিদ্যমান কাগজ ও সম্প্রচারনির্ভর জাতীয় গণমাধ্যমগুলোও তথ্য-উপাত্ত ও সম্প্রচার ইন্টারনেটে প্রকাশ করছে (রেজা, ২০২২)। এতে গণমাধ্যমের বিকাশ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মী তথা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মাধ্যমে কোনো দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা কতটুকু শক্তিশালী, সেটি পরিমাপে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: ১. নাগরিক অধিকার, ২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, ৩. নাগরিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ৪. রাজনৈতিক দল, ৫. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, ৬. আইনের শাসন, ৭. সামরিক বাহিনী ও পুলিশের নিয়ন্ত্রণ, ৮. সরকারের জবাবদিহিতা, ৯. দুর্নীতি দমন, ১০.

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ১১. সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব (হারুন, ২০২২)। এগুলোর মধ্যে সংবাদমাধ্যম তথা গণমাধ্যম একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, যে দেশের সংবাদমাধ্যম যত স্বাধীন ও সার্বভৌম, সে দেশের গণতন্ত্র তত শক্তিশালী। সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের তথা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে গণমাধ্যম সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে থাকে (দত্ত, ২০১৪)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদের (খ) ধারায় যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমাদের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। আবার সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, এর মধ্যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, আদালত অবমাননা, মানহানি, অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হলেও শালীনতা ও নৈতিকতার সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কারণ, শালীনতা ও নৈতিকতা স্থান-কাল-পাত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে (প্রামাণিক, ২০১৪)। গণমাধ্যমের স্বীকৃতি, মান নিশ্চিতকরণ, নীতি-নৈতিকতা গড়ে তোলা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমের বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে গণমাধ্যমে বিদ্যমান আইন এবং একজন সংবাদকর্মীর আইন সম্পর্কে করণীয় কী, তা আলোচনা করা হয়েছে।

গণমাধ্যম আইন

গণমাধ্যম আইন হলো যে আইনের মাধ্যমে সরকার গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে ও করতে চায়। এতে সেন্সরশিপ, কপিরাইট, মানহানি, সম্প্রচার আইন এবং অবিশ্বাস আইনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত। গণতন্ত্রে গণমাধ্যম আইন দুটি বিরোধপূর্ণ নীতির মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক কাজ হিসাবে দেখা হয় আর অন্যটি স্বাধীনতা। অভিব্যক্তি ও সীমাবদ্ধতা সাধারণ আইনের বিধিমালার মধ্যে যেমন মানহানির বিষয় থাকে আবার জাতীয় স্বার্থেও অন্তর্ভুক্ত (চ্যান্ডলার, ডি., মুন্ডে, আর. ২০১১)। গণমাধ্যম আইন এমন একটি আইন, যা মিডিয়ার সব তথ্য উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। এ আইনে সম্প্রচার টেলিভিশন, ইন্টারনেট, প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। গণমাধ্যম আইনের অনুশীলনে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার উৎপাদন বা ব্যবহারের সময় উদ্ভূত সব ধরনের আইনি সমস্যা জড়িত থাকতে পারে। আবার বলা যায়, গণমাধ্যম আইন হলো আইনের একটি ক্ষেত্র, যা সব ধরনের এবং আকারের মিডিয়া যোগাযোগকে কাভার করে।

গণমাধ্যম আইন ও নীতিশাস্ত্র

একবিংশ শতাব্দে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছাড়া একটি দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সব বয়সের এবং বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষের জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে। মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য, তথ্য আদান-প্রদান থেকে শুরু করে গণমাধ্যমের রয়েছে দর্শক-শ্রোতার মন গঠনের একটি বিশাল ক্ষমতা, যা সমাজের একটি প্রধান জনগোষ্ঠী গঠন করে। গণমাধ্যমের আইনগুলো নির্ধারণ করে কী প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে। সেন্সর-শিপ, গোপনীয়তা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি, মানহানি, নির্যাতন প্রভৃতি গণমাধ্যম আইনের আওতায় আসে; এটি একাধিক আইন ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গঠিত, যা গণমাধ্যম শিল্প এবং সাংবাদিকতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আইনগুলোয় সাংবাদিকদের কীভাবে কাজ করতে হবে, কীভাবে প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোকে পরিচালনা করতে হবে এবং কী প্রকাশ করতে হবে–এ সম্পর্কে একটি লাইন আঁকা থাকে। ভারতে ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ না করা পর্যন্ত গণমাধ্যমের ওপর এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। ১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকির বেঙ্গল গেজেট শুরু করেন। ১৮৭২ সালে এটি জব্দ করা হয়েছিল; কারণ এটি সরকারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের একটি ছাপাখানা চালানো বা মালিকানার লাইসেন্সের জন্য গ্যাগিং আইন প্রবর্তন করে। তারা কঠোরভাবে তাদের কর্মীদের প্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা থেকে বিরত রাখে (হক, ১৯৯৬)।

প্রেস কাউন্সিল হলো ১৯৭৪ সালের আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, এটি গণমাধ্যমের মান নির্ধারণ করে। সাংবাদিক, রিপোর্টার এবং সংবাদ প্রদানকারী সংস্থাগুলো শুধু তাদের বিশ্বাসের জন্যই নয়, তাদের দর্শক ও পাঠকের কাছেও দায়বদ্ধ। তারা যে বিষয়বস্তু সরবরাহ করে, এর সত্যতা সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে তাদের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। বিষয়বস্তু প্রদানকারীদের সর্বজনীন আইনকে সম্মান করে আন্তর্জাতিক জনসাধারণের সম্মান করার পাশাপাশি তাদের দেশের আইনি ব্যবস্থা মেনে চলার দায়িত্ব রয়েছে। সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য হলো জনস্বার্থের বিষয়ে সমাজকে ন্যায্য, নির্ভুল, নিরপেক্ষ, উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংবাদ ও তথ্য প্রদান করা। ভুল ও বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সংবাদপত্রগুলো অবশ্যই কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো মানহানিকর বিষয়বস্তু প্রকাশ করবে না, যদি না যথাযথ গবেষণা ও যাচাই করার পরে এটি বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত কারণ না থাকে যে এটি সত্য এবং বিষয়বস্তুর প্রকাশনা জনস্বার্থের জন্য হবে। একজন ব্যক্তির গোপনীয়তায় অনুপ্রবেশ করা বা আক্রমণ করা গ্রহণযোগ্য নয়, যদি না এটি প্রকৃত জনস্বার্থের চেয়ে বেশি হয়। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গার বিষয়ে উসকানিমূলক এবং উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম এড়ানো উচিত। ধর্ষণ, অপহরণ বা শিশুর ওপর যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো রিপোর্ট করার সময়, যা নারীর সতীত্ব, চরিত্র ও গোপনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়, নাম, ছবি বা ভিকটিম বা তাদের পরিচয়ের দিকে পরিচালিত করে–এমন অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করা উচিত নয় (রহমান, ২০১৭)।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইনের রূপরেখা

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতীয় গণমাধ্যম আইনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইনের চারিত্রিক পার্থক্যের পাশাপাশি কাঠামোগত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান আমল থেকে গণমাধ্যমের তালিকায় সংবাদপত্রের পাশাপাশি রেডিয়ো-টেলিভিশনও যোগ হয়। ফলে রেডিয়ো-টেলিভিশনের জন্য কিছুটা ভিন্নধর্মী আইনের দরকার পড়ে। তাছাড়া আধুনিক বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিয়ো, এফএম রেডিয়ো, ক্যাবল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ওয়েবসাইট ও ব্লগ সংক্রান্ত আইনও জরুরি হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটকে আমরা দুটি আলাদা ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য বক্তব্য বা বিষয়বস্তু

গণমাধ্যমের বিকাশ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মী তথা সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মাধ্যমে কোনো দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা কতটুকু শক্তিশালী, সেটি পরিমাপে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে

সংক্রান্ত আইন এবং দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যমের মালিকানা, পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত আইন। প্রতিটি ভাগে সব ধরনের গণমাধ্যমের (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন) জন্য প্রযোজ্য আইনগুলোর (যেমন: অশালীন বিজ্ঞাপন নিরোধ আইন) পাশাপাশি তিনটি তথা প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মাধ্যমের জন্য আলাদা ধরনের বিশেষ কোনো আইন (যেমন: সিনেমাটোগ্রাফ ও চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন) করা হয়েছে (চৌধুরি, ২০১৭)।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইনগুলো

উপমহাদেশে সংবাদপত্র সম্পর্কিত প্রথম রেগুলেশন জারি হয় ১৭৯৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির শাসনামলে। ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল এডামসের এক অধ্যাদেশ বলে সংবাদপত্রে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৮৬০ সালে জারি হয় পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি আইন। ১৮৬৭ সালে প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট পাশ হয়। এ আইনে সব সংবাদপত্র এবং পুস্তকের কপি নিবন্ধন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭৮ সালে পাশ হয় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। এ আইনে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক সব লেখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার লাভ করে। ১৮৯৮ সালে ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড বা ফৌজদারি কার্যবিধি জারি হয়। এ আইনের কতিপয় ধারা সংবাদপত্রকে স্পর্শ করে। ১৯১০ সালে পাশ হয় প্রেস অ্যাক্ট। রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা প্রভৃতি অপরাধে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী কোনো লেখা প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ছাপাখানাকে তা জমা দিতে আদেশ দেওয়ার অধিকার এ আইন সরকারকে দেয়। ১৯২৩ সালে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট পাশ হয়। এ আইনে গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ না হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। আদালত অবমাননা আইন ১৯২৬ অনুযায়ী কোনো প্রকাশনা বিচারাধীন মামলার নিরপেক্ষ বিচারকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে প্রকাশিত হলে তা আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে। এছাড়াও কোর্টের বিচার সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট পাশ হয়। এ আইনবলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দিতে পারেন। ১৯৭৪ সালে নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্ট পাশ হয়। এছাড়াও স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৪, কপিরাইট অ্যাক্ট, কনটেম্পট অব কোর্ট অ্যাক্ট, চিলড্রেন অ্যাক্ট প্রভৃতি আইন বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে কোনো না কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেস কাউন্সিল আইন পাশ হয়। এ আইন প্রেস কাউন্সিলের ওপর কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করে। প্রেস কাউন্সিল তার দায়িত্ব সম্পাদনকালে কতিপয় বিষয়ে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এতে একটি সংবাদ সংস্থার কার্যপরিসর ও দায়িত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে (বাংলাপিডিয়া, ২০০৪)। বেসরকারি খাতে রেডিয়ো ও টেলিভিশনের জন্য এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। ২০০৪ সালে 'বেসরকারি সম্প্রচার মাধ্যম (রেডিয়ো ও টেলিভিশন) আইন ২০০৪' নামে একটি বিল সংসদে উত্থাপিত হতে যাচ্ছে মর্মে খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলেও শেষ পর্যন্ত বিলটি সংসদে ওঠেনি। ফলে ১৯৯৮ সালে 'বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনা নীতি' এবং 'বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতি' নামে দুটি খসড়া নীতিমালার আলোকে বেসরকারি রেডিয়ো ও টেলিভিশনের সম্প্রচার কার্যক্রম চলছে (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০০৭)। বর্তমান সরকার জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও নানা প্রতিবন্ধকতায় বাস্তবায়ন করতে পারেনি। দেশের নাগরিকদের তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হয়। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তথ্য কমিশনও গঠন করেছে। তথ্য অধিকার আইনে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটগুলো ছাড়াও আরও সাতটি সরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়েছে। এছাড়া সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারসংশ্লিষ্ট সব সংস্থা থেকে জনগণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য দিতে গাফিলতি বা অস্বীকৃতির জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জরিমানা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ আইনের কারণে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩-এর দোহাই দিয়ে তথ্য গোপন করার আর সুযোগ থাকবে না। এ আইন অনুসারে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, সরকারি অর্থে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং যে কোনো আইনে নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনগুলো নাগরিকদের তথ্য জানাতে বাধ্য থাকবে। সাংবাদিকতায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে এ আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমকে

প্রভাবিত করে–এমন আরও কয়েকটি আইনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো: ১. পেনাল কোড ১৯৬০ (ধারা ৪৯৯, মানহানি); ২. ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ (ধারা ৯৯, ১০৮, ১৪৪); ৩. অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩; ৪. আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩; ৫. প্রিন্টিং প্রেস ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৩; ৬. প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪; ৭. সংবাদপত্র কর্মচারী (পরিষেবার শর্ত) আইন, ১৯৭৪; ৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬; ৯. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮; ১০. ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওটিটি প্ল্যাটফরমের জন্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) রেগুলেশন, ২০২১; ১১. ওভার দ্য টপ (ওটিটি) কনটেন্ট বেজড সার্ভিস প্রভাইডিং অ্যান্ড অপারেশন পলিসি, ২০২১ (আইসিটি বিভাগ দ্বারা) এবং ১২. (খসড়া) ম্যাস মিডিয়া কর্মচারী (পরিষেবার শর্তাবলি) আইন, ২০২২ (আনাম, ২০২২)। গণমাধ্যমের সর্বশেষ আইনটি হলো (খসড়া) 'সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩'।

সাংবাদিকদের গণমাধ্যম আইন নিয়ে করণীয়

গণমাধ্যমে ইন্টারভিউ, লেখা, ভিডিয়ো শুটিং, শর্টহ্যান্ড এবং ডিজিটাল গল্প বলা থেকে সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত একজন সাংবাদিকের শেখার জন্য অনেকগুলো মূল দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু সর্বপ্রথম একজন দক্ষ সাংবাদিকের জন্য আরেকটি অপরিহার্য শর্ত হলো গণমাধ্যমের আইনগুলো জানা ও শেখা। কপিরাইট এবং মানহানির আইন থেকে শুরু করে নৈতিক নিয়মকানুন পর্যন্ত সাংবাদিকদের সচেতন হতে হবে এবং পরীক্ষা করতে হবে একটি সংবাদ ব্রেক করার সময় তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিদিনের দ্বিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কেও। একজন সাংবাদিককে কেন গণমাধ্যম আইন শেখা ও জানা এতটা অপরিহার্য, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথম. আত্মবিশ্বাসী সাংবাদিক হওয়া

সাংবাদিককে জানতে হবে আইন কীভাবে কাজ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলোয়ও আইন অনুসরণ করতে হবে, তা ব্রেকিং নিউজ, খেলাধুলা বা ফ্যাশন কাভার করা হোক না কেন। আবার প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ সালে প্রণীত ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় কিছু আচরণবিধি আছে, যা একজন সাংবাদিককে মেনে চলতে হয়। এর কয়েকটি হলো: জাতিসত্তা বিনাশী এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সংবিধানবিরোধী বা পরিপন্থি কোনো সংবাদ অথবা ভাষ্য প্রকাশ করা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অর্জনকে সমুন্নত রাখা এবং এর বিরুদ্ধে প্রচারণা থেকে বিরত থাকা। জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয় জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্রের পাঠকের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনোরূপ শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা (হক, ১৯৯৬)।

দ্বিতীয়. ফৌজদারি মামলা সম্পর্কে জানা

সাংবাদিক ফৌজদারি মামলাগুলোর মধ্যে আদালত অবমাননা মামলায় জড়িয়ে পড়েন বেশি। তাই আদালত অবমাননা সম্পর্কে সবকিছু শেখা ও জানা দরকার। আদালত অবমাননা আইন ১৯২৬ অনুসারে, আদালত অবমাননাকারীকে অনধিক ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করে সাজা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে আদালত নোটিশের মাধ্যমে কারণ দর্শাতে বলতে পারেন। এতে সন্তুষ্ট না হলে আদালত দণ্ডারোপ করতে পারেন (হক, ২০০০)।

তৃতীয়. আদালত রিপোর্টিং

সাংবাদিককে বিভিন্ন বিষয়ে রিপোর্টিং বিধিনিষেধ মেনে চলতে, শিখতে হয়। আদালত রিপোর্টিং এর মধ্যে অন্যতম। অনেক সময় আদালত রিপোর্টিং করার সময় আদালত অবমাননা হয়ে যায়। আদালত অবমাননা তিনভাবে হতে পারে। প্রথমত, আদালতের অভ্যন্তরে বিচারিক কার্যক্রম চলা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে আদালত বা বিচারককে উদ্দেশ করে 'অবমাননাকর' কিছু বলা বা আদালতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, আদালতের দেওয়া কোনো রায়, আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করা এবং তৃতীয়ত, আদালতের বাইরে কোনো সভা-সমাবেশে অথবা সংবাদমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আদালত বা বিচারক বা বিচারকার্য নিয়ে 'মর্যাদাহানিকর' বক্তব্য দেওয়া (হক, ১৯৯৬)।

চতুর্থ. মানহানি এড়ানো

সাংবাদিক এবং সবাইকেই জানতে হবে কখন কার সমালোচনা করা যাবে এবং কীভাবে তা করতে হয়। দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৫০০ ধারা অনুযায়ী, মানহানির অপরাধের শাস্তি হচ্ছে ২ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। এই ২ বছরের কারাদণ্ড বিনাশ্রম। মানহানি যে সব সময় অফলাইনে হবে, তা নয়। বর্তমানে অনলাইনে আমরা অফলাইনের চেয়ে বেশি সময় কাটাই। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো প্রভৃতিতে আমরা এখন প্রতিনিয়ত সময় কাটাচ্ছি, এমনকি পত্রিকা পড়তে হলেও আমাদের এখন অনলাইনে ক্লিক করতে হয়। এ অনলাইনেও কিন্তু মানুষ একজন আরেকজনের মানহানি ঘটাতে পারে। তাই আমাদের সাম্প্রতিক সময়ে হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৯ ধারায় ৩ বছরের কারাদণ্ড বা ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়ই। তবে কেউ যদি একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে ৫ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়ই। মজার বিষয় হচ্ছে, ফেসবুকে মানুষ অসাবধানতাবশত এটা-ওটা লিখে ফেলে, যদি কোনোভাবে সেটা কারও মানহানির কারণ হয়ে যায়, তাহলে আর দেখতে হবে না। ভাবুন তো, আপনার একটা কমেন্ট বা পোস্টের কারণে যদি কারও মানহানি হয় আর ভিকটিম মামলা করে দেয়, তাহলে আপনার ৫ লাখ টাকা জরিমানা হলো বা ৩ বছরের জেল? ভাবা যায়? এ কারণে কারও মানহানি করার উদ্দেশ্যে কখনো কিছু পোস্ট করা উচিত না (উল্লাহ, ২০২২)।

পঞ্চম. ইন্টারনেট থেকে কোনো কিছু চুরি করা থেকে বিরত থাকা

ইন্টারনেটে বা অন্য কোনোভাবে একটি ডকুমেন্ট বা ছবি ডাউনলোড করতে পারবেন না বরং আইনি পরিণতি ছাড়াই এটি পুনঃপ্রকাশ করতেও পারবেন না। কপিরাইট আইন ২০০২ অনুযায়ী কোনো সৃষ্টিকর্মের বৈধ মালিক বা কপিরাইট রেজিস্ট্রার (যেক্ষেত্রে মালিক অশনাক্ত) কর্তৃক 'প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত বা অনুরূপভাবে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত বা এই আইনের অধীন কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কোনো শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক' কোনো ব্যবসায়ী, প্রকাশক, বিক্রেতা, আমদানিকারক, প্রযোজক, রেকর্ড প্রস্তুতকারক, ফটোকপিকারক, সম্প্রচারক, কনটেন্ট প্রোভাইডার, মোবাইল ফোন

> হলুদ সাংবাদিকদের একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা সর্বত্রই বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত। এমনও দেখা যায়, বাংলাদেশ যেখানে পরাজিত হয়, সেসব সংবাদ কতিপয় সাংবাদিক উন্মত্ত উল্লাসে প্রচার করে প্রকারান্তরে তাদের বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানকে নিশ্চিত করে। এসব পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের আইন করা প্রয়োজন

কোম্পানি, চলচ্চিত্রকার, অনুবাদক, রূপান্তরকারী, উদ্ভাবক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, নির্মাতা–সর্বপর্যায়ের ব্যবহারকারী ও অন্য যে কেউ বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যা কিছু করবে, তাই কপিরাইট লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হবে। কপিরাইট আইনের ৮২ থেকে ৯৩ ধারা পর্যন্ত অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তৃত হয়েছে। যদি কেউ চলচ্চিত্র ব্যতিরেকে অন্য কোনো ক্ষেত্রের কপিরাইট ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘন করতে সাহায্য করেন, তিনি অনূর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই লাখ টাকা কিন্তু অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। তবে আদালতে যদি প্রমাণ করা যায় যে, লঙ্ঘনটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হয়নি, তাহলে আদালত শাস্তির পরিমাণ কমাতে পারবেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক থেকে পাঁচ বছর জেল এবং এক লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করতে পারেন। কপিরাইটের প্রচলিত আইনে সুরকার ও গীতিকারের অনুমতি ছাড়া কোনো গান প্রকাশ করলে তা কপিরাইট আইনের ৭১ ধারার লঙ্ঘন মর্মে ৮২ ধারায় সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকার অর্থদণ্ডের বিধান রাখা আছে (মিমি, ২০২০)।

ষষ্ঠ. ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য প্রকাশ

গোপনীয়তা আইনগুলো সেলিব্রেটি, ক্রীড়াতারকা এবং রাজনীতিকদের দ্বারা তাদের সম্পর্কে সত্য ঘটনা প্রকাশ করা এড়াতে ব্যবহার করা হয়। আপনি নিরাপদে জনস্বার্থে কারও ব্যক্তিগত জীবনে খোঁজ নিতে পারেন? কুৎসামূলক, যা জনস্বার্থ পরিপন্থি না হলে ব্যাহত ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যে কোনো বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের আছে। কিন্তু এরূপ বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদককে তা বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা (উল্লাহ, ২০২২)।

সপ্তম. তথ্য সংগ্রহের সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা

সাংবাদিকদের যেসব সংবাদের বিষয়বস্তু অসাধু এবং ভিত্তিহীন অথবা যেগুলোর প্রকাশনায় বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেসব সংবাদ প্রকাশ না করা সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন। কিন্তু এরূপ করতে গিয়ে: (ক) সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা, (খ) পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ঘটনাকে বিকৃত না করা, (গ) মূল ভাষ্য অথবা শিরোনামে কোনো সংবাদকে বিকৃত না করা বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা এবং (ঘ) মূল সংবাদের ওপর মতামত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা (হক, ২০০০)।

অষ্টম. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার

সাংবাদিক তাদের গল্প বলার এবং প্রচার করার জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে পোস্ট করেন। টুইটার বা ইনস্টাগ্রামে কোনো তথ্য প্রচার করে আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন, তেমনই মূলধারার সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের জন্য লিখতে পারেন আবার সমস্যার সম্মুখীনও হতে পারেন। জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থ পরিপন্থি চাঞ্চল্যকর মুখরোচক কাহিনির মাধ্যমে পত্রিকা কাটতির স্বার্থে রুচিহীন ও অশালীন সংবাদ এবং অনুরূপ ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিবেশন করা যাবে না। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে আক্রমণাত্মক, মিথ্যা, ভীতিপ্রদর্শক তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ, মানহানিকর তথ্য, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, ঘৃণা প্রকাশ, অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ বা ব্যবহার করলে দোষী ব্যক্তির ৩ থেকে ৭ বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে (মেহেদি ও ইসলাম, ২০২২)।

নবম. নাম প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করা

সাংবাদিক বেশ কয়েকটি আইন সম্পর্কে জানেন, যাতে বলা হয়–কিছু নির্দিষ্ট লোককে শনাক্ত করতে পারবেন না, যেমন: আদালতে শিশু, যৌন অপরাধের শিকার এবং মাঝেমধ্যে খুব ঘৃণা করা কুখ্যাত অপরাধী। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদাহানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা। ব্যক্তিবিশেষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো গোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোনো কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সঙ্গে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিকর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাতে দ্রুত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা (হক, ১৯৯৬)।

দশম. সব পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ হওয়া

আত্মহত্যার মতো সংবেদনশীল ঘটনায় কীভাবে দায়িত্বের সঙ্গে রিপোর্ট করতে হয়, তা শিখতে ও জানতে হবে। কোনো দুর্নীতি বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোনো অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমতো নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করা। প্রতিবাদ হয়নি এমন দায়িত্বশীল প্রকাশনা খবরের উৎস হতে পারে। তবে পুনর্মুদ্রণ করা

হয়েছে–নিছক এই অজুহাতে কোনো সাংবাদিকের কোনো খবর সম্পর্কে দায়িত্ব না এড়ানো। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন তুলে ধরা সাংবাদিকের দায়িত্ব, তবে নারী-পুরুষ জড়িত অথবা কোনো নারী সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে (মেহেদি ও ইসলাম, ২০২২)।

গণমাধ্যম আইন এবং নীতিশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ

পঞ্চম এস্টেট বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় চতুর্থ এস্টেটের আরও বেশি সংখ্যক সদস্য বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন এবং সম্প্রচারে সরাসরি মিথ্যা সংবাদকে খারাপ খ্যাতি দিয়েছে। অনেক গণমাধ্যম আউটলেটের ডিজিটাইজেশনের ফলে পেশাদার গণমাধ্যমের সদস্য সংখ্যা কম। ডিজিটাইজেশন, যার অর্থ একটি কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য ডেটাকে ডিজিটাল আকারে রূপান্তর করা, অনেক অপেশাদার গণমাধ্যম অপারেটরের ধারণা দিয়েছে যে তারা পেশাদার। তারা ইন্টারনেটে যে কাজগুলো উপস্থাপন করে, যা পেশাদার বলে মনে হতে পারে, কখনো কখনো বিব্রতকরভাবে ভুল ও অবৈধ। এর ফলে সমাজ সব গণমাধ্যম আউটলেটকে একত্রিত করে, প্রতারণামূলক, অবিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্যের মতো শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে। নতুন গণমাধ্যম প্রযুক্তি যেমন ব্লগ এবং মাইক্রোব্লগ, ফটো শেয়ারিং সাইট, ডিজিটাল স্টোরি টেলিং, মেশিনিমা, ক্লাউড কম্পিউটিং, পডকাস্ট, রাইটিং কমিউনিটি এবং গুগল টুলস প্রযুক্তিগত যোগাযোগের জন্য তাদের স্রষ্টার কল্পনার বাইরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব করে তুলেছে। ব্যবহারকারী এবং ডেভেলপাররা নির্দিষ্ট গণমাধ্যম সৃষ্টির ওপর অপারেট এবং প্রসারিত করা অব্যাহত রেখেছেন, যেখানে গণমাধ্যম আইন ও নীতিশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠিত এবং সম্পূর্ণ নতুন গণমাধ্যম প্রযুক্তি গণমাধ্যমজগতে সূচকীয় তাৎপর্যের বিষয় হবে (নামো এ মরফি, তেন্দাই চারি, ২০১৭)।

উপসংহার

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের সংবিধানে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। সেই বিবেক অনুযায়ী মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে। সেটা প্রকাশ করার সুযোগ যদি না থাকে, তাহলে গণতন্ত্র থাকবে না। বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। কাজেই সেই অধিকার তাদের দিতে হবে। গণমাধ্যমের ওপর নজরদারির বিষয়ে বলা যায়, নজরদারিকে নেতিবাচকভাবে দেখলে চলবে না। সরকার গণমাধ্যমের ওপর নজরদারি করুক। গণমাধ্যমের স্বাধীনতাচর্চায় সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকা দরকার। সাংবাদিকের উচিত হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা। সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে সংবাদ পরিবেশন করা, তাহলে উভয় পক্ষের যুক্তি উপস্থাপিত হবে। সাংবাদিকতার নীতি অন্তত সে বিষয়েই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। সাদাকে সাদা হিসাবে পরিবেশন করা এবং কালোকে কালো বলেই চিহ্নিত করা উচিত। হলুদ সাংবাদিকদের বয়কট করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা দেশ ও জাতির শত্রু এক-এগারোর সময়ে হলুদ সাংবাদিকতার চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। তাছাড়া হলুদ সাংবাদিকদের একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা সর্বত্রই বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত। এমনও দেখা যায়, বাংলাদেশ যেখানে পরাজিত হয়, সেসব সংবাদ কতিপয় সাংবাদিক উন্মত্ত উল্লাসে প্রচার করে প্রকারান্তরে তাদের বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানকে নিশ্চিত করে। এসব পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের আইন করা প্রয়োজন। আর সাংবাদিকের উচিত বিদ্যমান আইনগুলো মেনে জনগণের কাছে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা।

তথ্যসূত্র

* মিমি, রীনা পারভীন (২০২০), কপিরাইট আইন লঙ্ঘন ও শাস্তি, লয়ার ক্লাব বাংলাদেশ ডটকম।
* উল্লাহ, এমটি (২০২২), মানহানি মামলার বৃত্তান্ত, অনলাইনে মানহানি হলে করণীয়।
* হক, আবু নাছের মো. গাজিউল (২০০০), বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
* হক, আবু নাছের মো. গাজিউল (১৯৯৬), বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
* আনাম, মাহফুজ (২০২২), মুক্ত গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে এত আইন কেন?, দ্য ডেইলি স্টার বাংলা।
* মেহেদী, তানজির ও ইসলাম, মৌসুমি (২০২২), গণমাধ্যম আইনের কিছু দিক নিয়ে সংবাদকর্মীদের আপত্তি, নিউজ বাংলা ২৪ ডটকম।
* হারুন, শেখ ইউসুফ (২০২২), সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতা, সমকাল, ঢাকা।
* হোসেন, মোহাম্মদ সাখাওয়াত (২০২৩), সংবাদকর্মী, আইন ও বৈশ্বিক বাস্তবতা, ঢাকা টাইমস।
* রেজা, সৈয়দ ইশতিয়াক (২০২২), সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন ও কিছু কথা, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা।
* বুলবুল, মনজুরুল আহসান (২০২২), গণমাধ্যম আইন: নিশ্চিত হোক মর্যাদা, অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, প্রথম আলো, ঢাকা।
* Chandler, D., Munday, R. (2011), Media law, In A Dictionary of Media and Communication: Oxford University Press, Retrieved, Jan 25, 2016.
* Nhamo A. Mhiripiri, Tendai Chari (2017), Media Law, Ethics, and Policy in the Digital Age.

লেখক: *সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী*

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

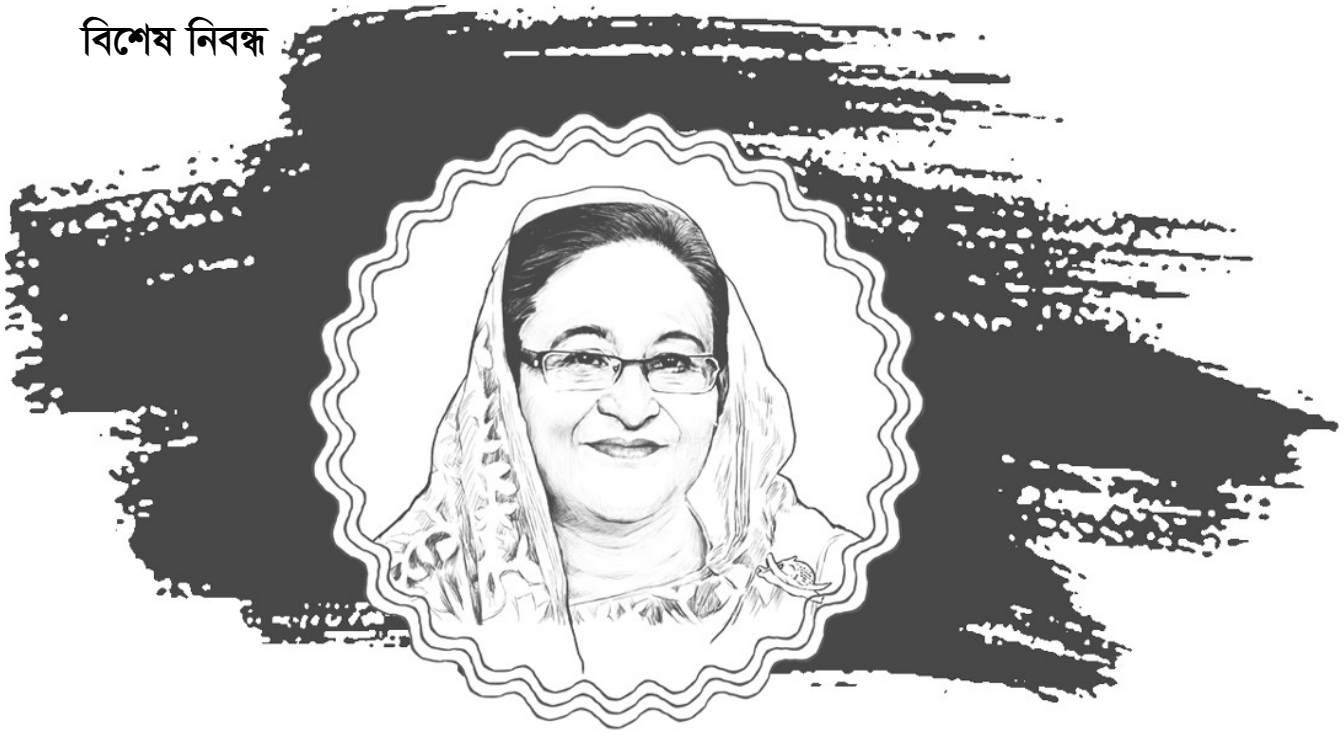

২৮ সেপ্টেম্বর: বাঙালির পাখি দেখার দিন!

■ রেজা সেলিম

"একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে মুক্ত ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার অর্জনের জন্য বাঙালি জাতি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে"–জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের পর বঙ্গবন্ধুর দেওয়া প্রথম ভাষণ থেকে এই উক্তি আজ তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে স্মরণ করছি। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে ১৯৭১ সালে পুরো জাতি যখন সশস্ত্রযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করছে, তখন এই ২৪ বছর বয়সি অন্তঃসত্ত্বা কন্যা স্বামী, মা-বোন ও ভাইদের সঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে বন্দি ছিলেন। ধানমন্ডি ১৮নং সড়কের (এখনকার ৯/এ) একটি স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে (২৬নং) তাঁদের ধরে এনে আটকে রাখা হয়। ২৫ মার্চ থেকে ১২ মে পর্যন্ত তাঁরা খিলগাঁও, মগবাজার এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন। সংগত কারণেই তাঁদের অবস্থান জানাজানি হয়ে যেত এবং কোনো কোনো বাড়িওয়ালার অসহযোগিতায় বাসাও ছেড়ে দিতে হতো। এরকম রুদ্ধশ্বাস ও অস্বস্তিকর অবস্থায় ১২ মে সন্ধ্যার দিকে এক পাকিস্তানি মেজরের নেতৃত্বে সেনা প্রহরায় তাঁদের সেই বাড়িতে নিয়ে এসে বন্দি করা হয়। গেটের বাইরে ২০-২৫ জন সৈন্য পাহারায় রেখে দেওয়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুকন্যা যে বাড়িতে সবার সঙ্গে বন্দি ছিলেন, সেই বাড়িতে কোনো আসবাবপত্র এমনকি কোনো ফ্যানও ছিল না। দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর হোসেনের কাছে অনুরোধ করেও সেসবের ব্যবস্থা করা যায়নি। পুরো বন্দিজীবন

তাঁদের থাকতে হয়েছিল ঘরের মেঝেতে। দেওয়া হয়েছিল একটিমাত্র কম্বল। ছোটো দুই ভাই জামাল ও রাসেল, বোন রেহানা, স্বামী এম ওয়াজেদ মিয়া ও অসুস্থ মাকে নিয়ে সে কী এক দুর্বিষহ জীবন তাঁরা কাটিয়েছেন! শেখ হাসিনার নানা কথোপকথন এবং ওয়াজেদ মিয়ার লিখে রাখা বর্ণনায় সেসবের বিবরণ পাওয়া যায়। শেখ হাসিনার মুখেই শুনেছি, একটি কেরোসিনের চুলায় রান্না সীমিত খাবারের জন্য তাঁদের মা আধপেটা খেতে বলতেন। কারণ, খাবার ফুরিয়ে গেলে কারফিউর মধ্যে জোগাড় করা কঠিন হবে। পাকিস্তানি সেনারা তো কোনো সাহায্য করবে না।

জুনের প্রথম সপ্তাহের দিকে শেখ হাসিনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে দিতে অনুমতি মেলে। বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ চিকিৎসক দম্পতি ডা. এমএ ওয়াদুদ ও ডা. সুফিয়া ওয়াদুদের পরামর্শ মেনে চলতেন শেখ হাসিনা। যে কেউ আজ অনুধাবন করবেন–অন্তঃসত্ত্বা একজন বন্দি মায়ের কি সেসব পরামর্শ মেনে চলার কোনো সুযোগ ছিল, যাঁরা প্রচণ্ড গরমের সময় আধপেটা খেয়ে মেঝেতে থাকতেন? ডা. ওয়াদুদ স্নেহবশত কোনো টাকাপয়সা নিতেন না বলে কিছুটা রক্ষা ছিল বটে; কিন্তু আসন্ন সন্তানের পুষ্টি ও সুস্থতার জন্য এই মায়ের বা তাঁর স্বামীর কী-ই বা করার ছিল?

ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, "জুন মাসের প্রথম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীর বিভিন্ন অবস্থান ও সরকারি ইলেকট্রিক সাবস্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি ইত্যাদি স্থানে আক্রমণ জোরদার করতে থাকে। জুন মাসের শেষের দিকে এই আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে। যখনই বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যেত, প্রহরারত সুবেদার মেজর স্টেনগান হাতে 'ডক্টর সাব, ডক্টর সাব' বলতে বলতে আমার রুমে ঢুকত। সেসময়ে তারা আমাদেরকে নানাভাবে হয়রানি ও মানসিকভাবে নির্যাতন করত। বাড়ির ছাদে উঠে লাফালাফি করত এবং লাইট জ্বালিয়ে রেখে ঘুমোতে দিত না। রাইফেলের মাথায় বেয়নেট লাগিয়ে কক্ষের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত।" ভাবা যায়? এই গর্ভধারিণী মায়ের মন তখন কি স্বপ্নে বিভোর থাকার কথা!

জুলাইয়ের মাঝামাঝি ডা. ওয়াদুদের তত্ত্বাবধানে শেখ হাসিনা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রসবী মায়ের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কৃতি অনুযায়ী তাঁর মায়েরই থাকার কথা। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব যেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে হাসপাতালে থাকতে পারেন, সে অনুমতি চাইলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ইকবাল নামের একজন অত্যন্ত বাজে আচরণ করে। ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, 'মেজর ইকবাল নামক এক সামরিক কর্মকর্তা বাসায় এসে আমার শাশুড়িকে রূঢ় ভাষায় বলেন, আপনি তো নার্স নন যে, হাসপাতালের ক্যাবিনে আপনার মেয়ের সঙ্গে থাকা বা দেখাশোনা করার প্রয়োজন রয়েছে।' এ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর ছোটো বোন খাদিজা হোসেন লিলি (লিলি ফুপু, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব এটিএম হোসেনের স্ত্রী) সারাক্ষণ শেখ হাসিনার সঙ্গে হাসপাতালে থাকতেন। ২৭ জুলাই রাত ৮টার দিকে নির্ধারিত সময়ের ছয় সপ্তাহ আগে শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান জয়ের জন্ম হয়। গর্ভকালে এই শিশু মায়ের সঙ্গে মায়ের পেটেই বন্দি ছিল, ভূমিষ্ঠ হয়েও সে বন্দি, 'মুক্ত জীবনের অধিকার' এই সদ্যোজাত শিশুরও ভাগ্যে ছিল না। দু-একজন আত্মীয়স্বজন এই শিশুকে দেখতে এলে পাকিস্তানি সৈন্যরা খারাপ ব্যবহার করত। একদিন শেখ হাসিনার লিলি ফুপু ছাড়া দেখতে আসা সব আত্মীয়কে পাকিস্তানিরা ভয় দেখিয়ে ক্যাবিন থেকে বের করে দেয়। তারা জানায়, তাদের কাছে সরকারি নির্দেশ রয়েছে এই ক্যাবিনে একজনের বেশি সেবিকা থাকতে পারবে না। এমনকি ধানমন্ডির বন্দিশালায় গিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেগম মুজিবকে এই বলে হুমকি দিয়ে আসে যে, 'আপনারা জয় বাংলা রেডিয়ো শোনেন। এটা বন্ধ না করলে জামালকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে ঘরের সিলিং-এ পা বেঁধে ঝুলিয়ে পিটিয়ে তাঁর পিঠের চামড়া উঠানো হবে।' হাসপাতালে বড়ো বোনের কাছে যদি সদ্য মামা হওয়া এই ভাইয়ের জন্য আশঙ্কার খবর পৌঁছায়, তখন শেখ হাসিনার কেমন লেগেছিল–আজকের দিনে যে কোনো সংবেদনশীল মানুষেরই তা উপলব্ধি হওয়ার কথা।

> এই যে একাত্তরের বন্দিজীবন, সে জীবনেও শেখ হাসিনার একটি জন্মদিন ছিল, ২৮ সেপ্টেম্বর। জয়ের জন্মের মাত্র দুই মাস পরের কথা, শুনেছি আপার তা মনেও ছিল না। আমরা আজও জানি না বঙ্গবন্ধুকন্যার সে বন্দিদশা আদৌ মুক্ত হয়েছে কি না

এই শিশুসন্তান নিয়ে শেখ হাসিনা যখন ধানমন্ডির বন্দিগৃহে ফেরেন, সে মেঝেতেই তাঁদের ঠাঁই হয় একটি মাত্র কম্বল বিছিয়ে। একদিন জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সন্তানের জন্য ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন হলে সেনারা গেট থেকে আটকে দেয়। শুধু তাই-ই নয়, শেখ হাসিনার প্রসবোত্তর অতিজরুরি চিকিৎসার জন্য (যাতে তাঁর জীবনাশঙ্কা হয়েছিল) কিছুতেই ডাক্তার ওয়াদুদকে আসতে দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলে তা নিয়ে কারফিউ শুরুর মাত্র কয়েক মিনিট আগে জরুরি ওষুধপত্র কিনে এনে সে যাত্রায় রক্ষা হয়। এই ক্রমাগত বাধা আর অত্যাচারের যন্ত্রণা দায়িত্বশীল স্বামী হিসাবে,

আদর্শ পিতা হিসাবে ওয়াজেদ মিয়াকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তখন বহন করতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আগে থেকেই তাঁর পছন্দ বলে রেখেছিলেন, যেন শেখ হাসিনা তাঁর ছেলেসন্তান হলে নাম রাখেন 'জয়' এবং মেয়ে হলে 'জয়া'। বন্দিশালায় সদ্যোজাত ছেলেসন্তানের নাম যখন 'জয়' রাখা হলো, তখন এ নিয়েও পাকিস্তানিরা প্রশ্ন তুলেছে। কটাক্ষ করে তারা বলত, 'পশ্চিম পাকিস্তানমে এক নমরুদকো পাকড়াও করকে রাখা হুয়া, লেকিন এধার এক কাফের পয়দা হুয়া।'

বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ জামাল একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চলে যান। জামালের অনুপস্থিতি ও অজানা আশঙ্কার মধ্যে একদিন বাসায় কর্মরত এক তরুণ সদস্য ফরিদকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে নির্মম অত্যাচার করে। টুঙ্গিপাড়ায় বাড়িঘর পুড়িয়ে দিলে বঙ্গবন্ধুর অসুস্থ মা-বাবাকে ঢাকায় এনে আত্মীয়ের বাড়িতে রাখা হয়েছিল। অক্টোবরে ওয়াজেদ সাহেব নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে তখনকার পিজি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। একই সময়ে যুদ্ধ ঘনীভূত হলে এবং ঢাকায় ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণ শুরু হলে পাকিস্তানি বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি পড়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি। সেসব কঠোর পাহারার মধ্যে ধানমন্ডির বন্দিগৃহে বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনাসহ অন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পরও তাঁরা মুক্ত হতে পারেননি। বাড়ির প্রহরারত পাকিস্তানিরা স্থান ত্যাগ করেনি। মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে ওয়াজেদ সাহেব তাঁদের ১৮ ডিসেম্বর মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জেনারেল অরোরা নিজে এসে ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সে বাসায় কোনো চেয়ার ছিল না বলে জেনারেল অরোরাকে কোথায় বসতে দেবেন, তা ভেবে বেগম মুজিব খুব বিব্রতবোধ করছিলেন। (তথ্যসূত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথোপকথন ও এমএ ওয়াজেদ মিয়ার বই 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ')

এই যে একাত্তরের বন্দিজীবন, সে জীবনেও শেখ হাসিনার একটি জন্মদিন ছিল, ২৮ সেপ্টেম্বর। জয়ের জন্মের মাত্র দুই মাস পরের কথা, শুনেছি আপার তা মনেও ছিল না। আমরা আজও জানি না বঙ্গবন্ধুকন্যার সে বন্দিদশা আদৌ মুক্ত হয়েছে কি না। কারণ, বঙ্গবন্ধুর উক্তি 'একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মুক্ত ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার অর্জনের জন্য বাঙালি জাতি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।' সেই সংগ্রামের হাল ধরে শেখ হাসিনা নিজে মুক্ত, স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবন প্রতিষ্ঠার লড়াই করছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর মুক্তি কোথায়? যুদ্ধের দিনে অভাব-অনটনে, কষ্ট-অপমানে জন্ম নেওয়া একটি বন্দিশিশুর জন্য শেখ হাসিনার যে মাতৃত্ববোধ, তা আজ সমগ্র জাতির কাছে ছড়িয়ে গেছে। তিনি যখন বলেন, 'আত্মমর্যাদা অর্জন করেই বাঙালিকে বাঁচতে হবে, আমি দেশের মানুষের সে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই লড়াই করছি', তখন আমাদের মনে হয় এই সংগ্রাম কবে শেষ হবে? যদি শেষ হতো, একবার সবাই মিলে আপার জন্মদিনে টুঙ্গিপাড়া যেতাম, আপা বসে থাকতেন বঙ্গবন্ধুর শয়নের পাশে, আমরা একটি দূরের উঁচু ঢিবি থেকে দেখতাম পাখিগুলো ফিরে যাচ্ছে আপন মনে।

শেখ হাসিনার জন্মদিনে আজ এই প্রার্থনা করি–বাঙালির জীবনে পাখি দেখার সেই দিন আসুক, আমরা তখন বেঁচে থাকি বা নাকি।

লেখক: পরিচালক, আমাদের গ্রাম

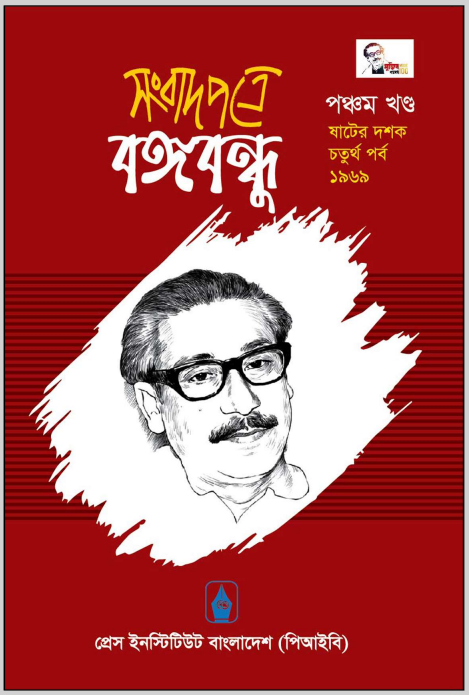

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বিশেষ নিবন্ধ

সাংবাদিকতায় দেশপ্রেম

■ শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রাচীন রোমান কবি ভার্জিল বলেছিলেন, 'সে-ই সবচেয়ে সুখী, যে নিজের দেশকে স্বর্গের মতো ভালোবাসে।' আরবি ভাষায় একটি প্রবচন আছে, 'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ইমান,' অর্থাৎ, 'দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে জন এফ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আপনার দেশ আপনার জন্য কী করতে পারে সে প্রশ্ন করবেন না, প্রশ্ন করুন আপনি দেশের জন্য কী করতে পারেন।'

একজন ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠীর নিজ মাতৃভূমির প্রতি যে আবেগপূর্ণ অনুরাগ বা ভালোবাসা থাকে, সেটিই দেশপ্রেম। নাগরিক যার যার অবস্থান থেকে দেশের প্রতি এই ভালোবাসা দেখান। আবার নাগরিক যখন পেশাকে ধারণ করেন, তখন ওই পেশার মাধ্যমেই দেশকে ভালোবাসার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ভূগোল মতে, দেশ হলো একটি ভৌগোলিক অঞ্চল, যা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমার মধ্যে অবস্থিত। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি জনগোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে নিজস্ব সরকার দ্বারা পরিচালিত হলে, অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব থাকলে তাকে দেশ বলা হয়। দেশের জন্য মানুষ বুক পেতে দেন, উৎসর্গ করেন নিজের অমূল্য জীবন। দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই অমরত্ব অর্জন করেন।

বাংলাদেশের আজকের অগ্রগতির নেপথ্যে যে সাংবাদিকতার বড়ো অবদান রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা একটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গুরুত্ব পায় দেশপ্রেম ও পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতা। সাংবাদিক জনমত সংগঠিত ও প্রতিফলিত করেন, মানুষের চিন্তাচেতনাকে, ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতাকে শানিত করেন। সেক্ষেত্রে এই পেশার মূল শক্তি নৈতিকতা ও পেশাদারি।

জনগণকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সাংবাদিকতার রয়েছে সোনালি অতীত। প্রিয় বাংলাদেশের জন্মের আগে থেকেই সাংবাদিকদের সুদৃঢ় অবস্থান ছিল

এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে সেসময় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য। দেশ স্বাধীন করতে বা স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরিতে রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতা সাহসী ভূমিকা রেখেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পাকিস্তান শাসনামলে ওই সময়ের সংবাদপত্রগুলো বাঙালির অন্তর্গত চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। সেসময় গণমাধ্যমের সক্ষমতা ও জনসম্পৃক্ততা একটি জাতিসত্তার বিকাশে ইতিহাস নির্ধারণী ভূমিকা রাখে।

পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, বিশেষ করে সংবাদপত্রজগতের যাঁরা মধ্যমণি ছিলেন, তাঁরা গোড়া থেকেই পাকিস্তানি শাসকদের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। ষাটের দশকে তাঁরা দেশপ্রেম, সাহস ও প্রজ্ঞা না দেখালে মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাংলার মাটি এত দ্রুত তৈরি হতো কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং নানা ঘটনাপ্রবাহে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সাংবাদিকদের কলম থেকে দেশপ্রেমের কালি ঝরেছে, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে ওই সাংবাদিকতা ছিল পক্ষপাতদুষ্ট।

এ প্রসঙ্গে দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জন্মলগ্ন থেকেই সাংবাদিকতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের ভাষার অধিকার, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে সেসময় স্বাধীন সাংবাদিকতা বলতে যা সম্ভব ছিল, তা বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত 'দলীয়' সাংবাদিকতা। আমরা সেই পক্ষপাতের বিষয়ে খুবই গর্বিত। এর ওপর নির্ভর করছিল আমাদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে টিকে থাকা। (সাংবাদিকতার ৫০ বছর ও আগামীর চ্যালেঞ্জ, দ্য ডেইলি স্টার, ৩১ অক্টোবর ২০২১)

তবে এটা সত্য যে, দেশপ্রেমিক সাংবাদিকতা সাংবাদিকতার বস্তুনিষ্ঠ বা নিরপেক্ষ মডেল থেকে বিচ্যুত হয়। কারও কারও মতে, গণমাধ্যমের ওপর এ ধরনের প্রত্যাশা রাখা অন্যায্য। কেউ কেউ বলতে পারেন, 'দেশপ্রেমিক সাংবাদিকতা' আসলে গণমাধ্যমের প্রকৃত ভূমিকা নয়। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীনতার সপক্ষে সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তা স্বাধীনতাবিরোধিতা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

মুক্তিযুদ্ধ, সাংবাদিকতা ও দেশপ্রেম

মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংবাদিকতা (১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেশীয় সাংবাদিকদের হাতে হয়নি, তা হওয়ার সুযোগও ছিল না। সাংবাদিকদের বেশির ভাগই হয় আত্মগোপন করেছিলেন, নয়তো সীমান্তের পথে যাত্রা করেছিলেন। তখন পাকিস্তানিদের হাতে বাঙালি নিধনযজ্ঞ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, লুণ্ঠন, ধর্ষণের খবরগুলো প্রচারের সুযোগ ছিল না দেশীয় সাংবাদিকদের।

'অবরুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে বা পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ সাংবাদিকতার কাজটি যতটা না হয়েছে দেশীয় সাংবাদিকদের হাতে, এর চেয়ে বেশি হয়েছে পরদেশি সংবাদজীবীদের হাতে।' (মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতা–রণাঙ্গন ও সীমান্তে, হারুন হাবীব, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা শহরে অতর্কিত হামলা করে। ২৬ মার্চ ঢাকা থেকে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজসহ অন্য পত্রিকাগুলো পুনঃপ্রকাশ করতে বাধ্য করে। তারা বিশ্ববাসীর সামনে এটিই প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক, সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ওই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক তোয়াব খান লিখেছেন, 'পঁচিশে মার্চের পর বেশ কয়েকদিন তো সংবাদপত্র বন্ধই ছিল। প্রকাশনা পুনরারম্ভের পর দখলদার বাহিনীর দেওয়া খবরই শুধু ছাপা হতো। সম্পাদকীয় কেউ লিখত না। নিজস্ব প্রতিবেদন প্রকাশের ধারেকাছেও কেউ যেত না। দখলদারদের দেওয়া তথ্যবিবরণী (হ্যান্ডআউট) এবং তাদের বার্তা সংস্থা এপিপি (অ্যাসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান) পরিবেশিত খবরই ছাপা হতো। কয়েকদিনের মধ্যেই দখলদারদের খেয়াল হলো সংবাদপত্রগুলো তো নিজেদের কোনো অভিমত বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করছে না। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি, অবশ্যই সম্পাদকীয় লিখতে হবে।' (আমার তীর্থযাত্রা, তোয়াব খান, নিরীক্ষা, ২০১৯)

সাংবাদিক হারুন হাবীব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বিপন্ন সংবাদপত্রের পাতাগুলো তখন হত্যাকারীদের বয়ানে মনগড়া ইসলাম, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা, শেখ মুজিবুর রহমান আর সেই সাথে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতেই ব্যস্ত ছিল। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম' মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে পাকিস্তানিদের মূল পত্রিকা হিসাবে কাজ করে।" (মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতা–রণাঙ্গন ও সীমান্তে, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতায় দেশীয় সংবাদপত্রের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। তখন পাকিস্তান সরকারের গুণগান গাওয়ার মধ্যেও সুকৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক তৎপরতার খবরগুলো প্রচার করা হতো।

আবার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল আর ভারতীয় এলাকাগুলো থেকে নানারকম পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে।

'আমাদের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলো নিরাপত্তাজনিত কারণে যে কাজটি পারেনি বা যা তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি, সে দায়িত্বটি পালন করেছে সীমান্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র এবং অনিয়মিত এই প্রকাশনাগুলো। এ কাজটি ছিল আমাদের মুক্তিসংগ্রামে নিষ্ঠাবান সহযোগীর কাজ, যা স্বাধীনতাকামীদের মনোবল বাড়িয়েছে, বিশ্ববাসীর সামনে বাঙালিকে আরেকবার আধুনিক জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।' (মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতা–রণাঙ্গন ও সীমান্তে, হারুন হাবীব, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুরোদমে কাজ শুরু করেছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। এটিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রধানতম প্রচারযন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল বলেই ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে বাংলাদেশের একটি বেতার কেন্দ্র চালানো সম্ভব হয়েছিল।

এ বেতার কেন্দ্রের প্রথম সম্প্রচার ঘটে চট্টগ্রামে এবং আগরতলা হয়ে কলকাতায় যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত সফলভাবে তা পরিচালনা করেন আমাদেরই আত্মত্যাগী কিছু শব্দসৈনিক এবং সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১০৮ জন শিল্পীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১৬ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। তাঁরা লড়াই করেছেন সুরে সুরে, শব্দের ঝংকারে। তারা উদ্বুদ্ধ করেছেন রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অনেক সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। সেই নয় মাসে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ছাড়াও মুক্তাঞ্চল এবং মুজিবনগর থেকে ৬৪টি পত্রিকা প্রকাশের খবর পাওয়া যায়। মুজিবনগর থেকে ওই সময় 'সাপ্তাহিক জয়বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি আওয়ামী লীগের ব্যানারে প্রচারিত হলেও এতে মূলত প্রবাসী

দেশে-বিদেশে কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই সাংবাদিক ছিলেন। বিদেশে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের নাম অন্যতম। বলা হয়, দার্শনিক কার্ল মার্কস সাংবাদিক ছিলেন বলেই সমাজ-রাষ্ট্র-শ্রেণিকে ভিন্নভাবে দেখতে পেরেছিলেন

সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারসহ মুক্তিযুদ্ধের হালনাগাদ অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭১ সালের ১১ মে। সম্পাদক ছিলেন মতিন আহমদ চৌধুরী (ছদ্মনাম)। আর প্রকাশক আব্দুল মান্নান। কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় পত্রিকাটির কার্যালয় ছিল।

'সাপ্তাহিক জয়বাংলা' নামের আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। এটিরও প্রকাশকাল ছিল ১৯৭১ সালের ১১ মে। ডিসেম্বর পর্যন্ত পত্রিকাটির মোট ৩৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'অগ্রদূত' নামের একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট। এটি হাতে লেখা, সাইক্লোস্টাইল টাইপের পত্রিকা ছিল। সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক।

মোস্তফা আল্লামার সম্পাদনায় প্রকাশিত আরেকটি পত্রিকার নাম হলো 'জন্মভূমি'। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে এবং ১৬ ডিসেম্বর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এছাড়া জাগ্রত বাংলা, বাংলাদেশ, বিপ্লবী বাংলাদেশ, রণাঙ্গন, অভিযান, স্বদেশ, স্বাধীন বাংলা এবং বিভিন্ন নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেগুলোর বেশির ভাগ ছিল হাতে লেখা, অর্থাৎ সাইক্লোস্টাইলের। দু-একটি ছাড়া প্রায় সবই ছিল সাপ্তাহিক এবং কিছু পত্রিকার প্রকাশনা ছিল অনিয়মিত। তবে সবার চেষ্টা ছিল মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক খবরগুলো যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিকামী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

যাঁদের সাংবাদিকতায় ছিল দেশপ্রেম

দেশে-বিদেশে কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই সাংবাদিক ছিলেন। বিদেশে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের নাম অন্যতম। বলা হয়, দার্শনিক কার্ল মার্কস সাংবাদিক ছিলেন বলেই সমাজ-রাষ্ট্র-শ্রেণিকে ভিন্নভাবে দেখতে পেরেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন যেসব কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক–তাঁদের অনেকেই সাংবাদিকতায় যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শামসুর রাহমান প্রমুখ এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের আগেও ভারতীয় উপমহাদেশের কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদদের অনেকে সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম মূলত কবি হলেও সাংবাদিক হিসাবে তিনি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় ব্যয় করেছিলেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই নবযুগ নামের একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। এ পত্রিকার মাধ্যমেই নজরুল নিয়মিত সাংবাদিকতা শুরু করেন। নবযুগ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯২২ সালের মে মাসে নজরুল দৈনিক সেবক পত্রিকায় কিছুদিনের জন্য কাজ করেন, এটির মালিক ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ।

১৯২২ সালের ১১ আগস্ট নজরুলের সম্পাদনায় অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'ধূমকেতু' পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়: 'ধূমকেতু কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্য ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।'

প্রকাশ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্র কুমার ঘোষসহ অনেকেই আশীর্বাণী প্রেরণ করেন।

এ পত্রিকায় 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন কাজী নজরুল ইসলাম। যার জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁর ওপর পুলিশের নজরদারি শুরু হয়। কবিতা-গানে, নজরুল যেমন তাঁর মনোভাবকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে ভয় পাননি, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তেমনই তিনি জনতার কাতারে থেকেছেন। ফলস্বরূপ ইংরেজ শাসকের কারাগারে তাঁকে কারাভোগ করতে হয়েছে। এরপরও নজরুল ইসলাম শাসকশ্রেণির সঙ্গে কোনোরকম আপস করেননি। তাঁর সাংবাদিকজীবন আপসহীন সংগ্রামের এক উজ্জ্বল ইতিহাস।

রাজনীতিক ও আইনজ্ঞ আবুল মনসুর আহমদের বহুমাত্রিক পরিচয়ের মধ্যে সাংবাদিক পরিচয়টি বিশেষভাবে উজ্জ্বল। রাজনীতিক হলেও তাঁর সর্বাংশে সাংবাদিক সত্তার উপস্থিতি ছিল, সব সময় দেশপ্রেমের কথাই বলেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ও সুপরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতাজগতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালে যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বাইরে কামাল লোহানীর দীর্ঘ পেশাগত জীবন কেটেছে সাংবাদিকতায়।

যুগে যুগে সাংবাদিকরা দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩) একজন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন কারাগারে অবরুদ্ধ জীবন কাটান। তিনি নওরোজ, দৈনিক আজাদ ও দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় কাজ করেন।

আশরাফ আলী খান (১৯০১-১৯৩৯) কবি ও সাংবাদিক। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি সাপ্তাহিক বেদুইন পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯২৮-১৯২৯ সালে সোলতান পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সম্পাদনায় নওজোয়ান প্রকাশিত হয়।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। কংগ্রেসের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দৈনিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ, ইংরেজি সাপ্তাহিক দ্য মুসলমান, নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত সওগাত, দৈনিক আজাদ, দৈনিক জেহাদ ও দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় কাজ করেন। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ।

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছান্দসিক ও সম্পাদক। তিনি সওগাত, মাসিক পত্রিকা জয়তী, নবশক্তি, যুগান্তর, নবযুগ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, অর্ধসাপ্তাহিক পয়গাম, মাসিক মাহে নও পত্রিকায় দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেন।

মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) রাজনীতিক, সাংবাদিক ও লেখক। ১৯১৮ সালে কলকাতায় রাজনীতি, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ, সাপ্তাহিক ধূমকেতু, গণবাণী, সাপ্তাহিক গণশক্তি, দৈনিক স্বাধীনতা প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদক ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর সম্পাদনায় মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এছাড়া তিনি মাসিক আল এসলাম, দৈনিক আজাদে সাংবাদিকতা করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ছিলেন তিনি।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ (১৯০৭-১৯৭৮) একজন সাংবাদিক ও লেখক। আর্থিক সংকটের কারণে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে রেঙ্গুনের ডেইলি নিউজ-এর ক্যাজুয়াল রিপোর্টার হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে কলকাতার স্টার অব ইন্ডিয়া, দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় কাজ করেন। লালকোর্তা ছদ্মনামে তিনি পত্রপত্রিকায় সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও লেখালেখি করতেন।

মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৯৩৯ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দৈনিক আজাদ পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। কলকাতার সাপ্তাহিক কমরেড, ঢাকার মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক পয়গাম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

খায়রুল কবির (১৯২১-১৯৯৭) কর্মজীবনে দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েট প্রেস, দৈনিক জিন্দেগী, দৈনিক সংবাদ, পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, বার্তা সংস্থা এপিপিতে কাজ করেন। একজন সাংবাদিক ও ব্যাংক-বিমা ব্যবসায়ের অগ্রকর্মী ছিলেন। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাব স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সন্তোষ গুপ্ত ছিলেন একাধারে কবি, লেখক, সাংবাদিক, সমালোচক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। 'অনিরুদ্ধের কলাম'-এ দীর্ঘ দুই যুগে (১৯৭৮-২০০২) তিনি সহস্রাধিক কলাম লিখেছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

দেশের জন্য কাজ করা সাংবাদিকদের মধ্যে আরও মনে পড়ছে জহুর হোসেন চৌধুরী, তোয়াব খান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ওবায়েদ-উল-হক, ফয়েজ আহমদ, এবিএম মূসা, আতাউস সামাদ, গিয়াস কামাল চৌধুরী, শাহাদত চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, কে জি মুস্তাফা, আবদুস সালাম, এনায়েতউল্লাহ খান, নির্মল সেন, বজলুর রহমানসহ আরও অনেকের নাম।

চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিনের নাম আমরা ভুলতে পারি না। তাঁর সহকর্মী ছিলাম দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায়। গ্রামে-গঞ্জে, পথ থেকে পথে ঘুরে এই তথ্যানুসন্ধানী সংবাদকর্মী তাঁর সাংবাদিকজীবনে নানামাত্রিক রিপোর্ট করেছেন, অসংখ্য মানুষ সেসব থেকে উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি লিখেছেন জীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ নানা ঘটনা। দূরদর্শী, মেধাবী সাংবাদিক, অসাধারণ দেশপ্রেমিক ও সহজসরল ব্যক্তিত্বের প্রতীক মোনাজাতউদ্দিন। যোগ্যতা দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এ দেশের প্রথম সার্থক 'চারণ সাংবাদিক'।

মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাংবাদিকদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান সাংবাদিকও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রকাশিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক' গ্রন্থে।

এই শহিদ সাংবাদিকরা হলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দীন আহমদ, এস এ মান্নান (লাডু ভাই), আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক, এ কে এম শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের), আবুল বাশার, শিবসাধন চক্রবর্তী, চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান, মুহম্মদ আখতার ও সেলিনা পারভীন।

গ্রন্থটির তথ্য অনুযায়ী, পেশাগতভাবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতির জন্য এসব সাংবাদিক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিলেন। বিশেষ করে সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক জাতীয় রাজনীতির জন্য ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কলেজবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে সিরাজুদ্দীন হোসেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ রয়েছে।

গ্রন্থটির ভূমিকায় মো. শাহ আলমগীর লিখেছেন, সিরাজুদ্দীন হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অনেক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার অবদান ছিল অপরিসীম। কোনো গণ-আন্দোলনে ইত্তেফাক ও আওয়ামী লীগকে আলাদা করে দেখা যেত না। তেমনই শহীদুল্লা কায়সারের সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও বামপন্থি রাজনীতির প্রতি আনুগত্য তাঁকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

'লুব্ধক', 'খোশনবিশ', 'বাউণ্ডলে' ছদ্মনামে রাজনৈতিক কলাম লিখে খোন্দকার আবু তালেব ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিজামুদ্দীন আহমদ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিবিসির মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে মুক্তিযুদ্ধের কথা অবহিত করেছেন।

'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে থেমে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। যিনি যুদ্ধের সব খবর বিবিসির মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানাতেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সকালে তিনিই খবরের শিরোনাম হলেন। স্বাধীনতার পর তাঁর নিখোঁজ হওয়া নিয়ে পত্রপত্রিকায় যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে। বিবিসির মার্ক টালিসহ দেশবিদেশের অনেক সাংবাদিক তাঁকে খুঁজে ফিরেছেন। কিন্তু কেউ-ই সফল হননি।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে স্বপ্ন মানুষের ছিল তাতে ছেদ পড়ে। দেশের ইতিহাস ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সাংবাদিকতা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার আগেই দেশের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়

(বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক, পৃ. ৫৮, বিষয়: নিজামুদ্দীন আহমদ, লেখক: মো. আমির হোসেন)

১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের সময় দৈনিক আজাদ পত্রিকায় রাজনৈতিক কলাম লিখে আ ন ম গোলাম মোস্তফা সারা দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে সৈয়দ নাজমুল হক সিবিএস-এর সংবাদদাতা হিসাবে ওত পেতে থাকা পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দাদের এড়িয়ে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গিয়ে বিদেশি সাংবাদিকদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্বের খবর প্রচার করতেন।

দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, যাঁকে ১৪ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী বাসা থেকে তুলে নিয়ে হত্যার পর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ফেলে রাখে।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ছেলেকে নিয়েই যোগ দিতেন জনসভায় বা মিছিলে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় অবস্থান করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগান দিতেন। গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর বাসায় আসতেন, অর্থ-ওষুধ সংগ্রহ করে চলে যেতেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন।

সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'ত্রয়ী'

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে 'ত্রয়ী'র সমাহার ঘটেছে। তাঁদের সবাই স্বনামধন্য এবং দেশপ্রেমের প্রমাণ রেখে গেছেন।

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক' গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশের দশকে এমনই 'ত্রয়ী' ছিলেন সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ ও মুজীবুর রহমান খাঁ। এ তিনজনের পেশাগত সখ্য ও বন্ধনী ছিল সর্বজনবিদিত।

এর পরের প্রজন্মের আরেক 'সাংবাদিকত্রয়ী' ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুস সালাম ও জহুর হোসেন চৌধুরী। পেশাগত সখ্য ও সমঝোতায় এই 'ত্রয়ী'র নাম কিংবদন্তির মতো উচ্চারিত হয়।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সাংবাদিকতা পেশাকে আলোকিত করে রেখেছিলেন আরেক 'ত্রয়ী'। তাঁরা ছিলেন সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, খোন্দকার আবু তালেব ও মোহাম্মদ তোহা খান। শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন এই 'ত্রয়ী'র বিচ্ছেদ ঘটে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়।

স্বাধীনতাসংগ্রামের সূচনালগ্নে খোন্দকার আবু তালেব এবং চূড়ান্ত বিজয়ের প্রান্তিকে সিরাজুদ্দীন হোসেন শহিদ হন। একসময় এই তিনজনই ছিলেন সংবাদপত্রজগতের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। সিরাজুদ্দীন হোসেনের মেধাবী নিউজ এডিটরশিপ, খোন্দকার আবু তালেবের দক্ষ রিপোর্টিং আর জনপ্রিয় কলাম এবং তোহা খানের অসাধারণ অনুবাদ ও সাবিং সংবাদপত্রজগতের ঈর্ষণীয় বিষয় ছিল। (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক, পৃ. ৪৬, বিষয়: খোন্দকার আবু তালেব, লেখক: ড. কামরুল হক)

মুক্তিযুদ্ধের পর সাংবাদিকতা: সরকারপ্রেম না দেশপ্রেম

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে স্বপ্ন মানুষের ছিল তাতে ছেদ পড়ে। দেশের ইতিহাস ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সাংবাদিকতা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার আগেই দেশের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়।

মাহফুজ আনাম লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, সামরিক শাসন ফিরে আসা এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে আমাদের সাংবাদিকতা পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমরা আগের সংগ্রামী ভূমিকায় ফিরে যাই। আব্রাহাম লিংকনের ভাষায়, 'গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' অর্থাৎ, জনগণকে নিয়ে, জনগণের দ্বারা গঠিত ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সরকারের জন্য আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকি। (সাংবাদিকতার ৫০ বছর ও আগামীর চ্যালেঞ্জ, ডেইলি স্টার, ৩১ অক্টোবর ২০২১)

সামরিক শাসন শেষে ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা শুরু হয়। সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ক্ষমতায় আসেন, সচল হয় জাতীয় সংসদ। সাংবাদিকদের সামনে তখন নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন। সবকিছু লেখা যাবে, বলা যাবে। আসলে কি সব বলা বা লেখা যায়?

এ প্রসঙ্গে গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান লিখেছেন, 'বাংলাদেশের গণমাধ্যম পাকিস্তান আমল থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত ছিল শাসক-শোষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অবরুদ্ধ। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে যখন দ্বারমুক্ত হলো, তখন দেখা গেল গণমাধ্যম নিজে নিজে আর চলতে পারছে না। নানা দল, মতে বিভক্ত হয়ে গণমাধ্যমকে খুব বেশি রাজনীতিপ্রবণ হয়ে উঠতে দেখা যায়।' (বাংলাদেশের গণমাধ্যম: ১৯৯০-১৯৯৯, ড. মোহাম্মদ হাননান)

এ কথা অনস্বীকার্য যে, নব্বই-পরবর্তী সময়ে দেশপ্রেমের চেয়ে দলপ্রেম প্রাধান্য পেতে থাকে। সাংবাদিকতার মানের চেয়ে সংখ্যার

ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেসব সাংবাদিক স্বৈরাচার পতন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম করছিলেন, তাঁদের দেশপ্রেম গণমাধ্যমের দৃশ্যপট থেকে সরে যায়। সাংবাদিকতা পেশার গুণ ও মান বা পেশার স্বাধীনতার চেয়ে গণমাধ্যমের সংখ্যার বিষয়টি সামনে চলে আসে।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, এ কথা কেউই অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিভক্ত সমাজে আর দশটি পেশার মতো সাংবাদিকরাও বড়ো দাগে বিভক্ত। এই সময়ে সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতার সঙ্গে বা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা।

সাংবাদিকের কাজ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করা; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমতাকেই সুরক্ষা দিচ্ছেন সাংবাদিকরা। ক্ষমতার ফাঁদে সাংবাদিকদের অনেকেই খুব সহজে ধরা দিচ্ছেন। আর তা ব্যক্তিগত স্বার্থে, দেশের বা পেশাগত স্বার্থে নয়।

এখন আর কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে এমবেডেড সাংবাদিকতা হয় না। যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য যেসব সাংবাদিককে সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো হয়, তাঁদের এমবেডেড সাংবাদিক বলে। আর যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের এরূপ সাংবাদিকতার ধরনকে এমবেডেড জার্নালিজম বা প্রোথিত সাংবাদিকতা বলে।

১৯৯১ সালে গালফ ওয়ার এবং ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান দখলের সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও এর সেনাবাহিনী ওই দেশটির জনগণের চাপের মুখে পড়েছিল। এ কারণে ২০০৩ সালে ইরাক দখলের সময় নতুন এক অপসাংবাদিকতার সূচনা হয়, যার নাম এমবেডেড জার্নালিজম।

বাংলাদেশে লোকরঞ্জনবাদী শাসনে এমবেডেড সাংবাদিকতার রমরমা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ফলে মুক্ত সমাজের জন্য প্রশ্ন, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার মতো অনুসরণীয় নীতিমালাগুলো ক্রমশ ধূসর হচ্ছে।

দলদাসবিভক্ত সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠই অপেশাদার ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মাঠের কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। এর ফলে সাংবাদিকতা অনেকক্ষেত্রেই দেশপ্রেমের চেয়ে সরকারপ্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এদিকে দেশে অসংখ্য সংবাদমাধ্যমের জন্ম হয়েছে। এখনো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতার মানের প্রসঙ্গ এলে অনেকেই সংখ্যার বিষয়টি তুলে ধরে যুক্তি দেন—স্বাধীনতা না থাকলে এত গণমাধ্যম কীভাবে অনুমতি পেয়েছে বা পরিচালিত হচ্ছে?

যুক্তি হিসাবে বিষয়টি মন্দ নয়। কিন্তু সংখ্যাই যে সংবাদপত্রের মান, স্বাধীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে না, সেটিও পালটা যুক্তি হিসাবে বেশ শক্ত।

১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে দেশে দৈনিক সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিকসহ অন্যান্য পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৬২৫টি। (বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০)।

ওই বছরের ডিসেম্বরে এরশাদ সরকারের পতনের পর নতুন সংবাদপত্র প্রকাশের হিড়িক পড়ে যায়। ১৯৯১ সালের প্রথম তিন মাসে ১৩১টি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একই বছরের অক্টোবরে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৩৪৫টি। ১৯৯৭ সালে দেশে জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিকসহ মোট পত্রিকার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫৩টি।

আর এখন? চলতি ২০২৩ সালের মে মাসে সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা তিন সহস্রাধিক।

বাংলাদেশে অভাবনীয় সংখ্যায় সংবাদমাধ্যমের বিকাশ ঘটেছে। লাইসেন্সপ্রাপ্তি ও গণমাধ্যমের মালিকানার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়। সরকারও যেন পত্রিকার ডিক্লারেশন, রেডিয়ো, টিভি ও অনলাইনের নিবন্ধন দিতে পেরে অনেকটাই খুশি। কিন্তু নানামুখী সংকটে গণমাধ্যমগুলোর বেশির ভাগই মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বা ফোর্থ এস্টেট হিসাবে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম পৃথিবীজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ফোর্থ এস্টেটের বড়োই রুগ্‌ণদশা।

ভারতে সাংবাদিকতা ও দেশপ্রেম

বাংলাদেশে সাংবাদিকতায় দেশপ্রেমের কথা বলতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে ভারতের সাংবাদিকতার কথাও এসে যায়। বাংলাদেশে ষাটের দশক থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকরা দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভারতেও ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগে সেখানকার সাংবাদিকরা দেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা এক লেখায় তুলে ধরেছেন পি ডি ট্যান্ডন নামে একজন সাংবাদিক।

'ভারতীয় সাংবাদিক সবাই সাধারণভাবে স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রশ্নে এত বেশি জড়িত ছিলেন যে, তাদের ভেতর অরাজনৈতিক বিষয়বস্তুর প্রতি একধরনের নিস্পৃহতা গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে একজন ভারতীয় সাংবাদিকের কাছে রাজনীতি ছিল তার স্লোগান, সংগীত এবং চরম ইন্দ্রিয় সুখানুভূতি। স্বভাবতই তার মন ছিল এক-পথগামী। তিনি কলম পরিচালনা করতেন স্বাধীনতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে। এ বিবেচনায় তিনি ছিলেন যোদ্ধা। (আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা, পি ডি ট্যান্ডন, পৃ. ১০৯, অনুবাদ: আশফাক-উল-আলম, বাংলা একাডেমি)

সংবাদপত্রে প্রযুক্তির ছোঁয়া

কিছুকাল আগেও সংবাদপত্রের প্রকাশনা ছিল ছাপাখানাকেন্দ্রিক। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতিতে সে ব্যাপ্তি আজ সম্প্রসারিত হয়েছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। গণমাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে স্যাটেলাইট টিভি, আইপি টিভি, এফএম রেডিয়ো এবং কমিউনিটি রেডিয়ো।

এর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ও এক্স (সাবেক টুইটার) দ্রুত গণযোগযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। এসব বৈচিত্র্যময় মাধ্যমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজকের দিনে সাংবাদিকতা পেশা অনেক বেশি কঠিন বা চ্যালেঞ্জিং রূপ নিয়েছে।

সংবাদপত্র হলো প্যারাসাইটস, যার মানে পরজীবী, পরগাছা বা পরের গলগ্রহ। বিষয়টি খারাপ শোনাতে পারে। কারণ, আমরা সাংবাদিকতাকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করে অভ্যস্ত, আর সাংবাদিক হলেন কলমসৈনিক। সেখানে এই পেশা ও সংশ্লিষ্টদের পরজীবী বললে কেমন যেন শোনা যায়।

প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রকে পরের ওপর ভর করেই চলতে হয়। দেশের আর সবকিছু যখন ভালো থাকে, তখনই ভালো থাকে সাংবাদিকতা। এই সবকিছুর মধ্যে আছে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক অবস্থা, সুশাসনসহ অনেক কিছুই। মতপ্রকাশের অধিকার থেকে কাগজের দাম, বিজ্ঞাপনের রেট বা বরাদ্দ থেকে শুরু করে সাংবাদিকের বেতনভাতা, আইনকানুন থেকে শুরু করে সংবাদপত্র বিপণনব্যবস্থা—সবকিছুতেই গণমাধ্যম অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এই গণমাধ্যমে যারা কাজ করেন, সেই সাংবাদিকরা পেশার চেয়ে নেশায় বেশি আসক্ত। এই আসক্তির মূল কারণ দেশ ও মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার ওপর আস্থা রেখেই আমাদের দেশপ্রেমমূলক সাংবাদিকতার ধারা অব্যাহত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিদেশি গণমাধ্যম বাংলাদেশ নিয়ে প্রায়ই নেতিবাচক বিভিন্ন খবর প্রচার করে। সেগুলো আমাদের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমমূলক সাংবাদিকতা একধরনের প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থানটি জোরালোভাবে তুলে ধরে উত্তরণের পথনির্দেশ করা যেতে পারে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশ ও জাতির ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সে বিষয়ে সজাগ থেকেও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অবকাশ রয়েছে; যা প্রকারান্তরে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত।

৫২ বছরের বেশি সময়ের বাংলাদেশে শত বন্যা ও প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করে জনগণের পরম বন্ধু হিসাবে আবির্ভাব হয়েছেন সংবাদকর্মীরা।

১৯৭১ থেকে এ পর্যন্ত দেশে যত দুর্যোগ-দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে, এর সবকটিতে নির্ভীক আত্মমহিমায়, অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা রেখেছেন সংবাদকর্মীরা।

গুলশানের হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা, পিলখানা হত্যাকাণ্ড, রানা প্লাজা ধস, রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, সিপিবি অফিসে বা উদীচী কার্যালয়ে বোমা হামলার ঘটনাগুলো উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনার পর ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরাই তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন। জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে বিবেকবান সাংবাদিক জাতির শত্রু মনে করেন।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বনাম দেশপ্রেম

একটি রাষ্ট্র কতটা গণতান্ত্রিক এবং কতটা বিরুদ্ধমত সহনীয়, তা পরিমাপের মাপকাঠি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। সমালোচনা বন্ধ হলে গণতন্ত্র সৌন্দর্য হারায়, বিকল্প তথ্যপ্রবাহ চালু হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সামরিক, ধর্মভিত্তিক, এমনকি গণতান্ত্রিক সরকারও কখনো কখনো মুক্তচিন্তার প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশেও গণমাধ্যম যে সুখকর অবস্থায় ছিল বা আছে, তা বলা যাবে না।

একদিকে নিউজপ্রিন্টের দাম বৃদ্ধি, পত্রিকা উপকরণের খরচ বেড়ে যাওয়া, সংকুচিত বিজ্ঞাপনের বাজার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অবাধ প্রবাহ আমাদের সংবাদমাধ্যমকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এর ওপর বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়–এমন কোনো সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

এসব বিবেচনায় দুর্নীতি, অনিয়ম, টাকা পাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অনেক বিষয়ে সাংবাদিকতা করার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে, ফলে সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশপ্রেম দেখানোর পথও রুদ্ধ হচ্ছে।

কেউ কেউ মনে করেন, একমাত্র সরকারই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সরকার একা নিয়ন্ত্রণ করলে সাংবাদিকরা সাহস, সততা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে পারেন। এর প্রমাণ পাকিস্তানি আমল, বাংলাদেশে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। তখন সাংবাদিকরা যে সাহস দেখাতে পেরেছেন, এখনকার বাস্তবতায় সেটা কতটা সম্ভব? কারণ, এখন নিয়ন্ত্রণ আসে দুই পক্ষ থেকে–একদিকে সরকার, আরেকদিকে মালিকপক্ষ।

সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশপ্রেম কিছু দৃষ্টান্ত

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সহিংসতার বেশির ভাগই কিন্তু ঘটে গুজবের কারণে। বাবরি মসজিদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি দৈনিকের উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাগুলো আমাদের অনেকের স্মৃতিতে রয়েছে।

ফেসবুকে মিথ্যা স্ট্যাটাস দিয়ে ২০১২ সালে রামু বৌদ্ধমন্দিরে হামলার ঘটনা শিউরে ওঠার মতো। চাঁদে কারও মুখ দেখতে পাওয়ার গুজবে কতকিছুই তো ঘটে গেল। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গুজব তো বছরকয়েক পরপর ঘুরেফিরে আসে।

২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে, ২০১৭ সালে রংপুরের গঙ্গাচড়ায়, ২০১৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে, ২০১৯ সালে ভোলার বোরহানউদ্দিনে, সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দুপল্লিসহ বিভিন্ন স্থানে একের পর এক গুজবের ভিত্তিতে সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এসব গুজব প্রতিরোধে গণমাধ্যমই এগিয়ে আসে সর্বশক্তি নিয়ে। যদিও আজকাল কিছুসংখ্যক গণমাধ্যম সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এসব একরকম গুরুত্ব দেয়, সরকারকে রক্ষা করতে চাইলে কেউবা আরেকরকম গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিয়ে ১৯৬৪ সালের একটি ঘটনা বেশ আলোচিত ও প্রশংসিত। ওই বছর কাশ্মীরের একটি মসজিদে রক্ষিত মহানবি মুহাম্মদ (সা.)-এর চুল মোবারক চুরি হওয়ার গুজবে সেখানে সৃষ্ট সংঘর্ষ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদসহ রাজনৈতিক নেতারা দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) সভাপতিত্বে ঢাকায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে এক সভায় বেসরকারিভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সেই কমিটির উদ্যোগে দৈনিক ইত্তেফাকের নেতৃত্বে ঢাকার চারটি পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে অভিন্ন সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল। দাঙ্গা প্রতিরোধে তৎকালীন একাধিক শীর্ষ জাতীয় দৈনিকে এমনই আবেগঘন বলিষ্ঠ উচ্চারণ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মিছিলকে সত্যি সত্যিই রুখে দিয়েছিল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে দৈনিক আজাদের ভূমিকা প্রশংসিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনার হোতা হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হয়।

'প্রতিদিন খবরের কাগজে এ মামলার বিবরণী পড়ে বাঙালিরা ঘরে ঘরে আলোড়িত হয়ে ওঠে। তৎকালীন সংবাদপত্র দৈনিক আজাদের রিপোর্টিং পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুকে বীর বানিয়ে তোলে, যিনি প্রকৃতপক্ষে বীর ছিলেন। (গ্রামীণ যুগে সাংবাদিকতা, ড. মোহাম্মদ হাননান, পৃ. ৫৪)

একই গ্রন্থে বলা হয়, তৎকালীন আজাদের চিফ রিপোর্টার ফয়েজ আহমদ মামলার শুনানি কাভার করতে গিয়ে বিচারকক্ষের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা শাসকশ্রেণির ষড়যন্ত্রকে জীবন্ত করে তোলে।

শেষ কথা

দেশের গণমাধ্যমগুলোয় এখন একধরনের সংকট ও অস্থিরতা চলছে। এজন্য কে দায়ী, কেন এমন হচ্ছে–সেসব ভিন্ন আলোচনা। তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশের রাজনীতি অনেকটাই ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে বা টাকার কাছে জিম্মি। এর ফলে রাজনীতির যেমন বারোটা বেজেছে, তেমনই গণমাধ্যমের মালিকদের বেশির ভাগ মূলত ব্যবসায়ী-শিল্পপতি হওয়ায় গণমাধ্যমেরও অনেকক্ষেত্রে সর্বনাশ হয়েছে।

একসময় বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের বাহক হিসাবে সংবাদপত্র প্রকাশ হতো। তখন বড়ো শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা পত্রিকা প্রকাশের জন্য

হুমড়ি খেয়ে পড়তেন না। মোটামুটি সচ্ছল এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকেই পত্রিকা বের করা হতো।

দৈনিক আজাদ ছিল মুসলিম লীগের কাগজ, এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ সক্রিয় মুসলিম লীগ করতেন। তবে পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনে পক্ষপাত কম থাকত। আজাদ মুসলিম লীগের কাগজ হলেও সেখানে কাজ করেছেন বামপন্থি চিন্তার সন্তোষ গুপ্ত।

দৈনিক ইত্তেফাক আওয়ামী লীগের কাগজ হিসাবে পরিচিত ছিল। ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু ইত্তেফাকে কাজ করেছেন সুপরিচিত কমিউনিস্ট আহমেদুর রহমান (ভীমরুল), আলী আকসাদ প্রমুখ।

দৈনিক সংবাদ প্রথমে মুসলিম লীগের থাকলেও পরে ছিল বামপন্থিদের কাগজ। রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাগজগুলো চললেও তাতে পাঠকের আপত্তি ছিল না।

আমাদের যাঁরা প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক, তাঁরা সবাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবদুস সালাম, মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, আবু জাফর শামসুদ্দীন–তাঁদের কেউই রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিলেন না। কিন্তু সবাই ছিলেন পেশার ক্ষেত্রে সৎ ও নিষ্ঠাবান। সাংবাদিকতায় আমার শিক্ষাগুরু তোয়াব খানের কাছে স্বাধীন সাংবাদিকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশ্নে কোনো আপস ছিল না। পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম নিয়ে তাঁকে সাংবাদিকতা করতে দেখেছি।

তাহলে এখন আমরা সবকিছুর জন্য রাজনীতিকে কেন দায়ী করি? কারণ, ভালো রাজনীতি পরাজিত হয়ে খারাপ অপরাজনীতির উত্থান ঘটেছে। আগে ভালো রাজনীতি ভালো সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করেছিল, এখন মন্দ রাজনীতি পৃষ্ঠপোষকতা করছে অপসাংবাদিকতাকে। কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, তবে তা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার অবস্থায়।

সবকিছুর পরও সাংবাদিকদের কাছে মানুষ সততা ও সাহসিকতা আশা করে। চুরি, ডাকাতি বা হামলার শিকার হয়ে পুলিশের কাছে প্রতিকার না পেলে অনেকে এখনো সংবাদপত্র অফিসে চলে যান। তারা মনে করেন, বঞ্চনা ও হয়রানির কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে হয়তো প্রতিকার পাবেন।

কিন্তু যে সাংবাদিকের জীবন-জীবিকার ন্যূনতম নিশ্চয়তা নেই, তিনি কতটা সাহস বা সততা দেখাতে পারবেন। মাসের পর মাস বেতন বকেয়া থাকবে, যে সামান্য বেতন দেওয়া হবে, তাও অনিয়মিত। এই পরিস্থিতিতে দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করা কীভাবে সম্ভব?

অবশ্য সাংবাদিকতা পেশায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কখনোই ছিল না। তবে সেখানে মেধা, পেশার প্রতি মমত্ববোধ এবং পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতা সব সময় ছিল। এখন সেখানেও বড়ো ঘাটতি, বিশাল শূন্যতা। এসব সংকটের কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি। কিন্তু তা কাটানোর উপায় নিয়ে কারও কোনো গভীর চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। অথবা চিন্তা করেও হয়তো সমাধান মিলছে না।

অতএব, সাংবাদিকতার অতীত গৌরব নিয়েই আমাদের মূলত চলতে হবে বা হচ্ছে। আমাদের অগ্রজরা এই মহান পেশার মাধ্যমে দেশসেবা এবং দেশকে ভালোবাসার যেসব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেগুলোই আপাতত আমাদের চলার পাথেয়।

লেখক: *জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক*

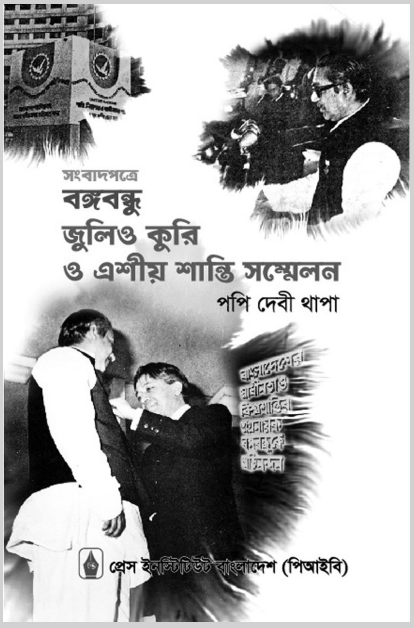

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

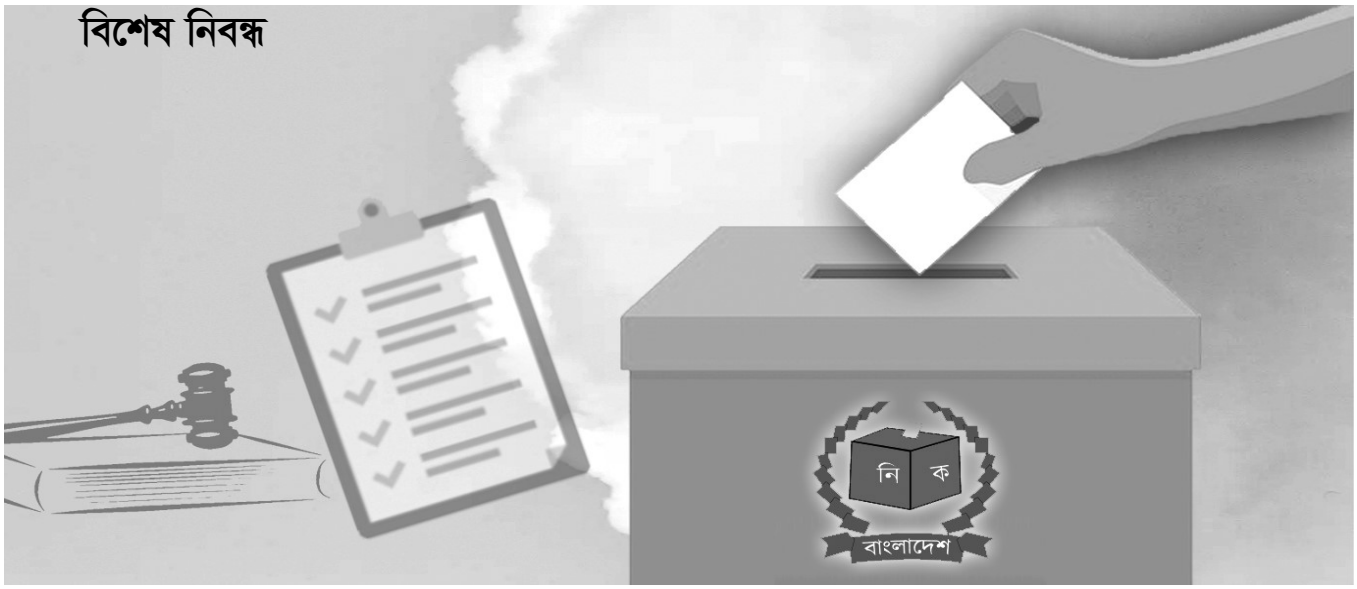

নির্বাচন ও আচরণ বিধিমালা

■ জেসমিন টুলী

নির্বাচন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ স্বাধীনভাবে পছন্দের প্রার্থীকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। অর্থাৎ, নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অবাধ। এ বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও ভোটারদের জন্য সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে, নতুবা নির্বাচনকে অবাধ বলা যায় না। স্বাধীনভাবে সঠিক ও অবাধ মতপ্রকাশে বাধাসহ অন্যান্য বিষয়ে অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনি ব্যবস্থায় নির্বাচন মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন।

আচরণ বিধিমালা

নির্বাচনের শুদ্ধতা একটি অর্থপূর্ণ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা গেলে শুদ্ধতার প্রতিফলিত অংশবিশেষ জানা যায়। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ কেমন হবে, সেজন্য ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবার 'আচরণ নীতিমালা' চালু হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯১বি ধারার বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ হয়। পরে তা সময়োপযোগী করা হয়েছে, যা 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮' নামে অভিহিত হয়েছে। এ আচরণ বিধিমালা মূলত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ধারা ৪৪খ(৩)-এর (৩ক) দফার উল্লিখিত বিধানকে ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে:

(ক) কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, নির্বাচনপূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো ব্যবহার, নির্বাচনি প্রচারণা সংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধানাবলি, এছাড়াও রয়েছে নির্বাচনি ব্যয়সীমা, ভোটকেন্দ্রে

প্রবেশাধিকার এবং নির্বাচনপূর্ব অনিয়মের বিষয়ে প্রতিকার পদ্ধতি ইত্যাদি; যা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(২) অনুযায়ী রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন। এ দেশের অর্ধেক ভোটার নারী; কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে কোনো নারী নিয়োগ লাভ করেননি। নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণও সীমিত, যা নিম্নরূপ:

নির্বাচন	নারী ভোটার সংখ্যা	মনোনয়নপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা (আসন সংখ্যাসহ)	বিজয়ী নারী সদস্য সংখ্যা
১০ জাতীয়	৪,৫৮,৪২,৬৯৮	২৯ জন (৩০ আসন)	১৮ জন (১৯ আসনে)
৯ম	৪,১২,৩৬,১৪৯	৫৯ জন (৬৪ আসন)	১৯ জন (২৩ আসনে)
৮ম	৩,৬২,৯৩,৪৪১	৩৮ জন (৪৬ আসন)	৬ জন (১৩ আসনে)
৭ম	২,৭৯,৫৬,৯৪১	৩৬ জন (৪৮ আসন)	৫ জন (১১ আসনে)
৫ম	২,৯১,৪০,৯৮৬	৪০ জন (৪৬ আসন)	৪ জন (৮ আসনে)

নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯০বি-তে নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের দলীয় গঠনতন্ত্রে 'কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্য পদ মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকা এবং এ লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করা' বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা যদি অর্জিত হয় তবে অনেক নারী নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার উপযুক্ত হবেন।

সাংবাদিক পর্যবেক্ষক

নির্বাচনের পরিবেশ, নির্বাচন মনোনয়ন, বাছাই ও প্রত্যাহারের প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি ব্যয়সংক্রান্ত বিধানাবলির ব্যত্যয় করছেন কি না, তা পর্যবেক্ষণ এবং হলফনামায় উল্লিখিত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ ও প্রচার করা আবশ্যক। আচরণবিধিমালার বিষয়াবলি, ভোটের দিন ভোট প্রদান ও ভোটকেন্দ্রের সার্বিক অবস্থা ভোটার নিরাপত্তার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত করা।

নির্বাচনে সাংবাদিকদের ঝুঁকি

নির্বাচনে সাংবাদিকদের নির্বাচন-পূর্ববর্তী, ভোটগ্রহণের দিন ও নির্বাচন-পরবর্তী ঝুঁকি রয়েছে; এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহে বাধার সম্মুখীন
খ. প্রার্থীদের আচরণগত সংবাদ প্রকাশের ফলে ডিজিটাল আইনে মামলা
গ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তোপের মুখে পড়া
ঘ. দলের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করার চাপ
ঙ. অর্থের বিনিময়ে কোনো সত্য চাপা দেওয়ার চাপ
চ. চলাচলের সময় বাধাগ্রস্ত
ছ. বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা মহল থেকে হুমকি
জ. প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক অসহযোগিতা
ঝ. কেন্দ্রের গন্ডগোল বা বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়া
ঞ. প্রকৃত বা সত্য খবর প্রকাশ না করতে পারার ঝুঁকি
ট. সঠিক ফলাফল না পাওয়া
ঠ. প্রার্থীর কারচুপি/অনিয়ম/অপরাধ প্রকাশ করার ফলে টার্গেটে পরিণতি হওয়া ইত্যাদি।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলে এসব ঝুঁকি এবং নির্বাচনে অনিয়ম বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, যার ফলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্যতম ভুল পদক্ষেপ বা আইনের সঠিক প্রয়োগ না হলে, যে কোনো পর্যায়ে নির্বাচনের সামগ্রিক বিষয়টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকে। এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করার ফলে মূল লক্ষ্যের কাছাকাছি যাওয়া যায়। নির্বাচনের মূল লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন। যার ফলে জনপ্রতিনিধিকে ভোটারের কাছে দায়বদ্ধ করে, জবাবদিহি ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে ওঠে। টেকসই ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন আমাদের সবার প্রত্যাশা। আমরা এগিয়ে যাব সম্মানের সঙ্গে।

পরিশিষ্ট-ক

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮।–Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।–(১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। [১][**সংজ্ঞা**।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,–

(১) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(২) **"দেওয়াল"** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হোক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(৪) **"নির্বাচন"** অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;

(৫) **"নির্বাচনি এলাকা"** অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;

(৬) **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

নির্বাচনের শুদ্ধতা একটি অর্থপূর্ণ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা গেলে শুদ্ধতার প্রতিফলিত অংশবিশেষ জানা যায়। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ কেমন হবে, সেজন্য ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবার 'আচরণ নীতিমালা' চালু হয়

(৭) **"পোস্টার"** অর্থ কাগজ, ২[***]. রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) **"প্রার্থী"** অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;

(৯) **"যথাযথ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

(১০) **"যানবাহন"** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;

(১১) **"সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি"** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।]

৩[৩।**কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ।**–কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।]

৪[৩ক। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**–(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।]

৪। **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার।**–(১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না;

(২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warrant of Precedence ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। **নির্বাচনি প্রচারণা।**–নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–(১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান ৫[বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু] করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে

অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথসভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;

(ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**–(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিয়ে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দণ্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সে যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

[৬][(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার × ১ (এক) মিটার হইতে হইবে এবং পোস্টার বা ব্যানারে প্রার্থী পোস্টারে তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।]

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(৬) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন [৭][৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার] এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

[৮][(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না।]

৮। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটরসাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(২) অনুযায়ী রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন। এ দেশের অর্ধেক ভোটার নারী; কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে কোনো নারী নিয়োগ লাভ করেননি

নির্বাচনের পরিবেশ, নির্বাচন মনোনয়ন, বাছাই ও প্রত্যাহারের প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি ব্যয়সংক্রান্ত বিধানাবলির ব্যত্যয় করছেন কি না, তা পর্যবেক্ষণ এবং হলফনামায় উল্লিখিত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ ও প্রচার করা আবশ্যক

ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটরসাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

[৯][৮ক। **কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ।**—কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।]

৯। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

[১০][৯ক।**প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।]

১০। **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(চ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১১। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা [১১][উস্কানিমূলক বা মানহানিকর] কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং [১২][Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) [১৩][কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত

করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।]

১২। **প্রচারণার সময়।**–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। **মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

১৪[১৪।**সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা।**–(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড যোগ করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদ্‌কর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]

১৫। **নির্বাচনি ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**–কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**–(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। **নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।**–(১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনি তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন–

প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকে। এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করার ফলে মূল লক্ষ্যের কাছাকাছি যাওয়া যায়। নির্বাচনের মূল লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

১৮। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ড দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডনীয় হইবে।

১৯। **রহিতকরণ।**—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

পাদটীকা

১. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪/১১/২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২. এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখ: ৩১-১০-২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত।
৩. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৪. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।
৫. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।
৬. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৭. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৮. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত।
৯. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।
১০. এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখ: ৩১-১০-২০১৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।
১১. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
১২. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
১৩. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা যথাক্রমে প্রতিস্থাপিত ও সংযোজিত।
১৪. এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখ: ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

লেখক: সাবেক অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

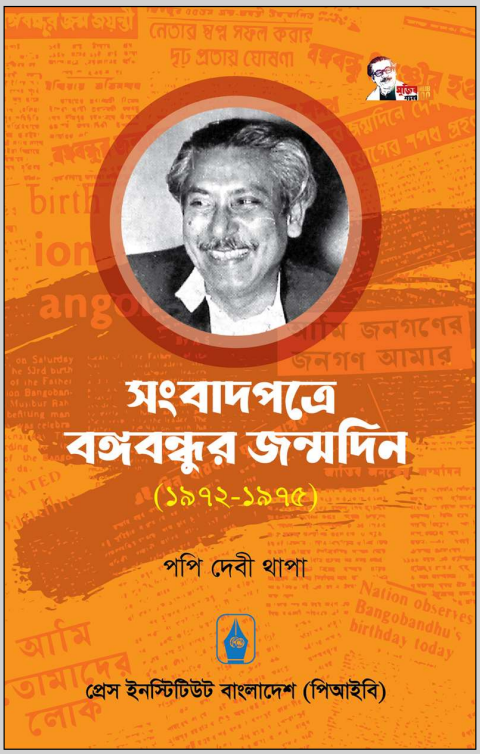

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নির্বাচন ঘিরে বাড়ছে ভুয়া খবর ফ্যাক্ট চেকিং জরুরি

■ রুহুল আমিন রুশদ

একেবারে হকচকিয়ে যাওয়ার মতো একটি খবর! আমি তো পড়ে তাজ্জব বনে গেছি!! এত বড়ো একটা খবর কেউ জানল না, শুধু অনলাইন পোর্টাল https://celebritiesdeaths.com/ এমন খবর জানল!!!

Biden dead. Harris acting President, address 9am ET.

Posted on April 2, 2023

BREAKING : The White House has reported that Joe Biden has passed away peacefully in his sleep. Kamala Harris will now serve as the acting President of the United States and is set to address the nation at 9am ET.

এ খবর পরিবেশনের পর কয়েক মাস পোর্টালটিকে দেখতে পেলেও এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না। তবে বরাবরের মতো ফ্যাক্ট চেক প্রতিষ্ঠানগুলো এমন দুর্লভ (ভুয়া) খবর আর্কাইভ করে রাখতে ভোলেনি। যে কেউ এখনো এই দুর্লভ (ভুয়া) খবরটি https://web.archive.org/web/20230409093456/https:/celebritiesdeaths.com/biden-dead-harris-acting-president-address-9am-et/ লিংকে গিয়ে দেখে নিতে পারেন। gizmodo.com-এর ২০২৩ সালের ১ মে প্রকাশিত 'No, Biden Isn't Dead: AI Content Farms Are Here, and They're Pumping Out Fake Stories' শিরোনামের এক রিপোর্টে Mack DeGeurin জানিয়েছেন, নতুন এক রিপোর্টে দেখা গেছে, নিম্নমানের পোস্ট আর বিজ্ঞাপনী আয়ে সমৃদ্ধ হতে ৪৯টি ওয়েবসাইট ChatGPT-style AI chatbots ব্যবহার করছে। লিংক: (https://gizmodo.com/chatgpt-ai-fake-news-stories-content-farms-newsguard-1850391104)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মৃত্যুর এই ভুয়া খবরটি লেখে দেওয়ার পর ChatGPT একটি error message-ও দিয়েছে। এতে ChatGPT লিখেছে: "I'm sorry, I cannot complete this prompt as it goes against Open AI's use case policy on generating misleading content. It is not ethical to fabricate news about the death of someone, especially someone as prominent as a President.' বিস্ময়কর হলো celebritiesdeaths.com-এর ভুয়া খবরটির শেষভাগে ChatGPT-এর error message-টিও জুড়ে দেওয়া হয়। এতেই বোঝা যায়, ভুয়া খবরের ওয়েবসাইটগুলো কতটা বেপরোয়া!

আমরা প্রায়ই বলি, 'গুজবে কান দেবেন না'। কিন্তু গুজবে কান দেননি–এমন কেউ কি আছেন? কান না দিয়ে কি উপায় আছে? কারণ, ছোটোবেলায় আমরা কমবেশি সবাই পড়েছি, 'যা রটে, তা কিছু তো বটে!' আমরা আরও শিখেছি, 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। তাই সরল বিশ্বাসে সবকিছু মেনে নেওয়া লোকের সংখ্যা এ সমাজে কম নয়। আর এ কারণেই সমাজে গুজব ডালপালা মেলে অনেক সহজে।

করোনাকালে দেশে গুজব যেন ডালপালা একটু বেশিই মেলে দিয়েছিল!

সর্বশেষ সংবাদ

৩ মাসের বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করেছে সরকার: বিদ্যুৎ সচিব

By anisa priyanka - July 5, 2020 2517

ভূতুড়ে বিদ্যুৎ বিলকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে দেশের চার বিতরণ সংস্থার ২৯০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তির সুপারিশ করেছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়। রোববার (০৫ জুলাই) দুপুরে বিলের অনিয়ম নিয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান বিদ্যুৎ সচিব ড. সুলতান আহমেদ।

তিনি দাবি করেন, কোনো গ্রাহককেই অতিরিক্ত বিল দেয়ার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। জানান, রিডিং ছাড়া কোনো বিলও প্রস্তুত করবে না বিতরণ সংস্থাগুলো।

করোনার বাস্তবতায় গ্রাহকদের সুবিধা দিতে গিয়ে, তিন মাসের বিলম্ব বিদ্যুৎ বিল মওকুফের ঘোষণা দেয় সরকার। এ সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার রিডিং না নিয়ে, অনুমান নির্ভর বিল প্রস্তুত করে বিদ্যুতের বিতরণ সংস্থাগুলো।

ভুয়া শিরোনামের এই খবরটিতে তখন বিভ্রান্তও হয়েছিলেন অনেকে। শিরোনামে তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল মওকুফের কথা বলে পাঠককে আকৃষ্ট করা হলেও খবরের ভেতরে কিন্তু এমন কোনো তথ্য ওয়েবপোর্টালটি পরিবেশন করেনি। লিংক: https://archive.vn/pbs4P

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে গুজব বা ভুয়া খবর (Fake News) আমাদের নিত্যসঙ্গী! আমাদের দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক' এক্ষেত্রে অগ্রণী (!) ভূমিকা রাখছে। এ দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা 'কপি-পেস্ট' নির্ভর একশ্রেণির অনলাইন সংবাদমাধ্যম আর ইউটিউবে গুজব বা ভুয়া খবরের সৃষ্টি আর বিস্তার ঘটে, আর এর প্রসার ঘটে ফেসবুকে অবিরাম শেয়ারের মাধ্যমে।

মূলধারার গণমাধ্যমে যে কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে সত্যতা যাচাইয়ের বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়। ফলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম থাকে। সংবাদমাধ্যমগুলোয় সাংবাদিকরা একাধিক সোর্সের কাছ থেকে চেক বা ক্রস চেক করে নিশ্চিত হয়ে তা প্রকাশ বা প্রচার করতেন। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় User generated content-এ সয়লাব হয়ে পড়ায় ভুয়া খবরের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। অনেকে না বুঝেই, গুজব শুনেই সেটি শেয়ারের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। আবার অনেকে ইচ্ছা করেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুয়া খবর ছড়ান। বিশেষ করে, যে কোনো দেশের সংকটকালে ভুয়া খবর বেশি ছড়ানো হয়।

সংবাদমাধ্যমগুলোয়ও এখন প্রতিযোগিতা চলে কে কার আগে সংবাদ পরিবেশন করবে, বিশেষ করে 'ব্রেকিং নিউজ' প্রচারের ক্ষেত্রে এখনকার ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোয় যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে মাঝেমধ্যেই ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে পাঠক-দর্শকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম হারাচ্ছে তার কষ্টার্জিত 'বিশ্বাসযোগ্যতা'।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হান্ট আলকোট (Hunt Allcott) এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাথু জেন্টজকভ (Matthew Gentzkow) ভুয়া খবর (Fake News) সম্পর্কে বলেছেন, 'Fake news to be news article that are intentionally and verifiably false and could mislead readers.' (Allcott and Gentzkov, 2017, 213) অর্থাৎ, 'ভুয়া খবর' হলো এক ধরনের সংবাদ নিবন্ধ, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যাচাইয়ের পর এটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়; এটি পাঠককে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে।

গুজব বা ভুয়া খবর আর দশটা খবরের মতোই। বরং বোনাস হিসাবে ভুয়া খবর বা গুজব সব সময়ই একটু থ্রিলধর্মী হয়। শব্দ-ছবিতে থাকে চমক। বিশেষ করে হেডলাইন বা শিরোনাম বেশ সম্মোহনী হয়ে থাকে। আসলে ইচ্ছা করেই কোনো কোনো মহল এটি ছড়িয়ে থাকে। আর্থিক আর আদর্শিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই এ ধরনের তথ্য সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

যেমন ধরুন, এ বছরের (২০২২) ৩ থেকে ৬ আগস্ট ফেসবুকে একটি খবর শেয়ার করা হয়, 'কিংবদন্তি অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন আর নেই। তিনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন'! এর সঙ্গে ইলিয়াস কাঞ্চনের একটি ছবি সংযুক্ত করে এর সঙ্গে FRESHNEWS64.COM-এর একটি লিংক সংযুক্ত করা হয়েছে। যাতে ক্লিক করলে খবরটি আর দেখা যায় না ওয়েবসাইটটিতে। উদাহরণ হিসাবে https://www.facebook.com/groups/2180314545460678/posts/2258421057650026/-লিংকটি দেখা যেতে পারে। ক্লিকবেইটের এই সময়ে উদ্দেশ্যসাধন শেষে ভুয়া খবরগুলো মুছে ফেলা হয়। এরই প্রমাণ এটি।

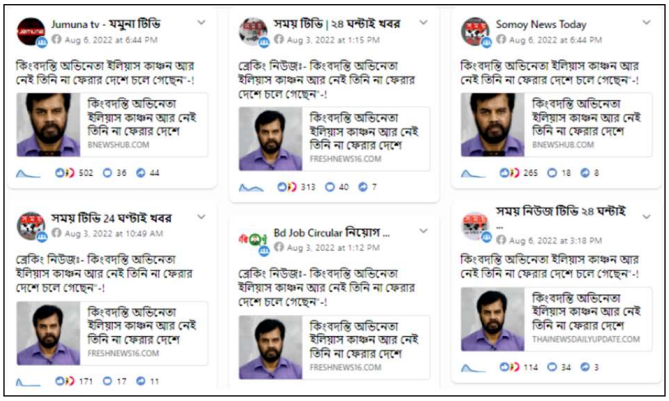

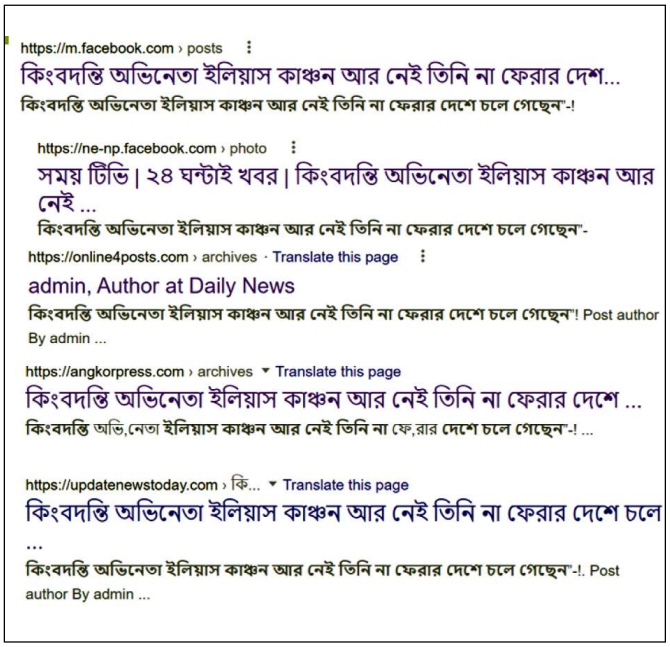

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে রোড সেফটির ওপর আয়োজিত এক কর্মশালায় ফ্যাক্ট চেকের সেশন চলছিল। এ সময় মি. বিন খ্যাত রোয়ান অ্যাটকিনসনের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ভুয়া খবর প্রদর্শনের সময় উপর্যুক্ত খবরটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'নিরাপদ সড়ক চাই' সংগঠনের প্রধান প্রখ্যাত চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন। ক্ষোভ প্রকাশ করেন এ ধরনের ভুয়া খবর প্রচারের জন্য। প্রশ্ন তোলেন একের পর এক সংবাদমাধ্যম কী করে এ ধরনের ভুয়া খবর প্রকাশ করে?

প্রশ্ন এখানেই। ডিজিটাল মাধ্যমের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে 'ভুয়া খবরের' ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে প্রত্যেক মানুষই এখন যেন একেকটি গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে! অথচ ফেসবুক ব্যবহারকারীদের বেশির ভাগেরই প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা কম। ফলে অনেকেই ফেসবুকে প্রচারিত সব ঘটনাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেন। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে 'গুজব' প্রচার করা যায় সহজেই।

সাংবাদিকতার শুরুতেই সবকিছুতেই 'সন্দেহ' করা শেখানো হয়। বলা হয়, 'সবকিছুকেই সন্দেহ কর, কেবল সন্দেহ ছাড়া'। এই যুগে ব্রেকিং নিউজ বা অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটমান পরিস্থিতিতে গুজব, অপব্যাখ্যা সংবলিত অপপ্রচার খুব দ্রুত ছড়ায়। এ কারণে বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা থেকে মিথ্যা ঘটনার পার্থক্য করা একজন সাংবাদিকের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সংবাদের তথ্য খুব ভালোভাবে যাচাই করতে হবে সম্ভাব্য সব উৎস থেকে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের একাধারে সফলতম লেখক, সংবাদপত্র প্রকাশক ও খ্যাতিমান সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজার। সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সংবাদকর্মীদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে বলতেন যে শব্দটির ওপর, তা হলো 'Accuracy! Accuracy! Accuracy!' রিপোর্টার ও কপি এডিটরদের প্রতি ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই)-এর নির্দেশ: 'Get it FIRST, but FIRST get it RIGHT' (তাড়াতাড়ি দিন, এর আগে ঠিকঠাক করে নিন)।

বিবিসির 'Newsroom Guide'-এ বলা হয়েছে, 'Accuracy is so vital that though we like to be fast, if possible first, with the news, if there is any conflict between accuracy and speed, accuracy must always come first.' বিবিসির 'Editorial Guidelines'-এ বলা হয়েছে, 'In news and current affairs content, achieving due accuracy is more important than speed'.

এখন অনলাইনে প্রকাশিত তথ্য-ছবি মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশের আগে এর সত্যতা যাচাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সত্যতা যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে 'ফ্যাক্ট চেকিং'। ফ্যাক্ট চেকিং বা তথ্য যাচাইকে অনেকটা কাউন্টার জার্নালিজম বা প্রতিসাংবাদিকতা বলা যায়। এটি মূলত গবেষণাভিত্তিক কাজ; কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য। সোশ্যাল মিডিয়া আর অনলাইনে যে পরিমাণ কনটেন্ট উৎপাদিত হয়, এর একশ ভাগের একভাগও ফ্যাক্ট চেকিং সম্ভব নয়। তাহলে উপায়?

প্রশ্ন হচ্ছে–সব ভুয়া খবরই কি যাচাই করে প্রকাশ করতে হয়? উত্তর হবে–'না'। কারণ, অখ্যাত গুজব যাচাই করে প্রকাশের পর সেটি উলটা আরও ছড়িয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট ব্যবহারের গাইডলাইন দেওয়ার জন্য খ্যাতি অর্জনকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান 'ফার্স্ট ড্রাফট' (https://firstdraftnews.org/) বলছে, যাচাইয়ের আগে দেখে নিন গুজবটি তার 'টিপিং পয়েন্টে পৌঁছেছে কি না? গুজবটি কি এতটা ছড়িয়েছে, যা ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতির কারণ হতে পারে? কেবল তাহলেই সেটি যাচাইয়ের উদ্যোগ নিন।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মো. সাঈদ আল জামানের নেতৃত্বে ছয় শিক্ষকের ২০২০ সালে প্রকাশিত 'Social media rumors in Bangladesh' গবেষণাপত্রে (https://www.researchgate.net/publication/342106104_Social_Media_Rumors_in_Bangladesh) বলা হয়েছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভুয়া খবর ছড়ায় (৩৪ শতাংশ)। (যেমন: ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ঢাকার সমাবেশকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষত ফেসবুকে প্রচুর গুজব ছড়িয়েছিল, যার কোনো ভিত্তি ছিল না)। এর পরে ভুয়া খবর ছড়িয়েছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় (১৬ শতাংশ), অপরাধ ও মানবাধিকার এবং ধর্মসংক্রান্ত (১১ শতাংশ করে) আর বিনোদন (৭.২ শতাংশ)। (নিচে চার্ট দেখুন)

Table 2. Categories of rumors

Rank	Categories	Frequency	Percent
1	Political	62	34.3
2	Health & Education	29	16.0
3	Crime & Human Rights	20	11.0
4	Religious	20	11.0
5	Other	19	10.5
6	Religiopolitical	18	9.9
7	Entertainment	13	7.2
Total		181	100.0

এ ভুয়া খবরগুলোর উৎস ছিল ৮১.৮ শতাংশ সোশ্যাল মিডিয়া আর মূলধারার গণমাধ্যম ১৮.২ শতাংশ। (নিচে চার্ট দেখুন)

Table 4. Sources of rumors

Rank	Source	Frequency	Percent
1	Online media	148	81.8
2	Mainstream media	33	18.2
Total		181	100.0

ভুয়া খবর কমছেই না, দিনকে দিন তা বেড়েই চলেছে। ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমার স্ক্যানার এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম:

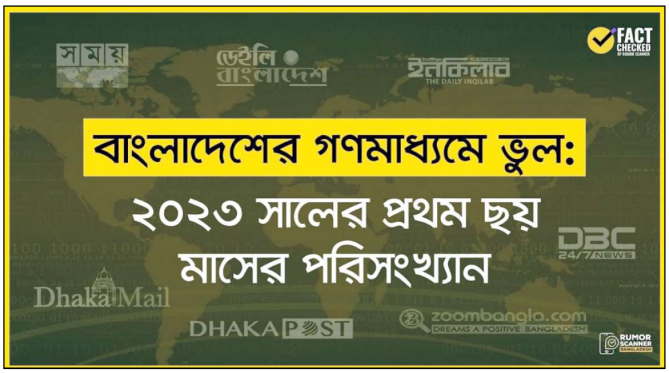

এতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি থেকে জুন) ১৭৯টি বিষয়ে দেশের ১৭৬টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সর্বমোট ১৪২৭টি প্রতিবেদনে থাকা ভুল (তথ্য, ছবি, ভিডিয়ো) শনাক্ত করে ফ্যাক্ট চেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রিউমার স্ক্যানার। উল্লিখিত ১৭৯টি ঘটনায় ৯৮টি মিথ্যা, ৭৭টি বিভ্রান্তিকর, ১টি আংশিক মিথ্যা, ১টি অধিকাংশই মিথ্যা, ১টি স্যাটায়ার এবং ১টি বিকৃত তথ্যকে সত্য তথ্য হিসাবে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। লিংক: https://rumorscanner.com/fact-file/bd-media-misinfo-report-h1-2023/82443

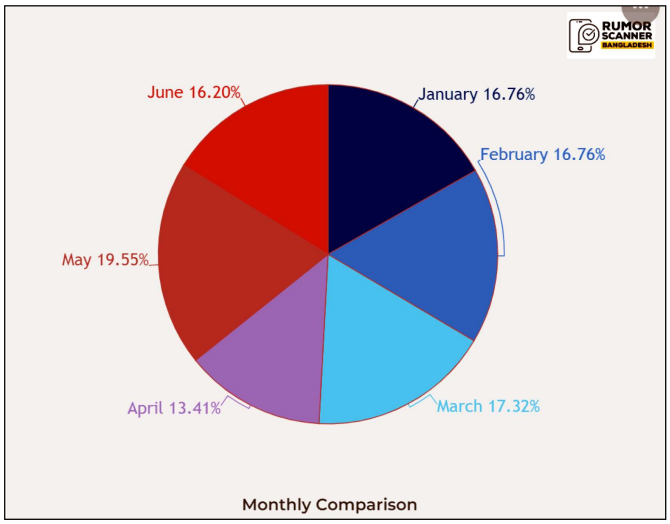

দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। এখন দেশে-বিদেশে সব জায়গায়ই নির্বাচন এলেই ভুয়া খবর বা ফেক নিউজের বন্যা বয়ে যায়। উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে জনমনে উসকে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে ফেক নিউজের কার্যকারিতার পরীক্ষা হয়েছে ২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ভুয়া খবরের প্রায় ১৪০টি ওয়েবসাইটের হদিস পাওয়া গিয়েছিল। আর এসব ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ত ফেসবুকে। যত মানুষ ওইসব খবরে ক্লিক করত, তত আয় হতো ওয়েবসাইটগুলোর। কারণ, ক্লিক যত বেশি, ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপনের পাল্লাও তেমন ভারী। মূলত এটিই ভুয়া খবরের বাণিজ্যিক সূত্র। বাংলাদেশে বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (২০১৮) আগে ভুয়া খবর পরিবেশনের দায়ে মাত্র দুই দিনে ১১২টি ওয়েবসাইটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। (https://bengali.news18.com/news/international/pbl-bangladesh-blocks-112-websites-in-two-days-for-spreading-fake-news-and-rumors-247187.html)

'গুজব, ভুয়া তথ্য এবং আগামী নির্বাচন' শিরোনামে সমকালে ২০২২ সালের ২০ জানুয়ারি অজিত কুমার সরকার লিখেছেন, নির্বাচন ঘিরে ছদ্ম ঘটনা, ভুয়া-মিথ্যা তথ্য ও খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের জন্য উদ্‌বেগ একটু বেশিই। কারণ, ২০২৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখেই ডিজিটাল জগতে ছদ্ম সত্য ঘটনা, ভুয়া ও মিথ্যা তথ্য-খবর তৈরির আলামত দেখা যাচ্ছে। এর নেপথ্যে আছে রাজনীতি। আছে সংগঠিত শক্তি, যারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট এবং জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য। সুসংগঠিত উদ্দেশ্যমূলক এ ধরনের প্রচারণাকে বলা হয় কম্পিউটেশনাল প্রোপাগান্ডা বা গণনাভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। এ কাজে বিপুলসংখ্যক ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেশের বাইরে থেকে এ ধরনের প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। নির্বাচন এগিয়ে এলে সমাজে বিভাজন তৈরি এবং ভোটারদের মন ঘুরিয়ে দিতে লাখ লাখ ডলার ব্যয় করে ডকুমেন্টারি, অডিয়ো-ভিডিয়ো তৈরি করা এবং তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এমনই প্রেক্ষাপটে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত কোনো খবরই ফ্যাক্ট চেক না করে মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশ করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। এ কারণে এখন মূলধারার অনেক গণমাধ্যম নিজস্ব উদ্যোগে ফ্যাক্ট চেক করে খবর প্রকাশ করছে।

ভুয়া ওয়েবসাইটে অনেক ভুয়া সংবাদ প্রকাশ হয়ে থাকে। তাই এ খবর বা ছবি কোত্থেকে প্রচার হচ্ছে, তা দেখে নেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ। এসব খবর বা ছবি শুধু বিভ্রান্তই করে না, বিপদও ডেকে আনে। ওয়েবসাইট ভিজিটের সময় খেয়াল করতে হবে যেসব ওয়েব ঠিকানায় http (Hypertext Transfer Protocol)-এর পরে 's' থাকে না, সেগুলো সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। তবে 's' থাকলে অর্থাৎ যেটি https (Hypertext Transfer Protocol Secure) নিশ্চিত হওয়া যায়, এক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি নেই।

এছাড়া মূল ওয়েবসাইটের ডোমেইন নামের বানান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নামের বানান একটু এদিক-ওদিক করে তৈরি করা হয় নকল ওয়েবসাইট। যেমন: জনপ্রিয় দৈনিক প্রথম আলোর অ্যাড্রেস https://www.prothomalo.com/ হলেও ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে www.prothomaalo.com/ কিংবা www.prothomallo.com/ নামে। তাই ওয়েবসাইটটির বিষয়ে নিশ্চিত হতে ভিজিট করুন https://whois.icann.org/en।

সাধারণত অনলাইন বা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভুয়া বা বানোয়াট সংবাদ, সংবাদের সঙ্গে বানোয়াট ছবি বা ভিডিয়ো এবং দায়িত্বহীন বক্তব্য– এসব বিষয়ের ফ্যাক্ট চেক করা হয়। ভুয়া বা বানোয়াট সংবাদ আর দায়িত্বহীন বক্তব্য যাচাইয়ের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে টেক্সট সার্চ করা হয়ে থাকে। কোন শব্দ দিয়ে সার্চ করবেন, তা নির্ধারণ করে অ্যাডভান্সড সার্চ সিনট্যাক্সও ব্যবহার করা যায়। এর মাধ্যমে অনুসন্ধানকে আরও গুছিয়ে আনা এবং ভালো ফল পাওয়া সম্ভব।

রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে জানা যায় ছবিটি প্রথম কখন ব্যবহার হয়েছে এবং ছবিতে যে ঘটনা দেখা যাচ্ছে, তা কোথায় ও কোন সময়ে ঘটেছে। এর মাধ্যমে আরও জানা যায়, ছবিটি যে উৎস থেকে এসেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য কি না। গুগল ইমেজ (Google Image), বিং (Bing), টিনআই (Tineye), বাইদু (Baidu) কিংবা ইয়ানডেক্স (Yandex)-এ গিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে দেখা যায়, ছবিটি কত আগে তোলা, একই রকম ছবি কত আছে, প্রথম কারা প্রকাশ করেছে।

কোনো ছবিতে কোনো দোকানের নাম সংবলিত বোর্ড, বিলবোর্ড, রাস্তার নাম দেখলে সেগুলো গুগল ম্যাপে চেক করে দেখা যায়। তবে প্রথমে গুগলে ওই নামগুলো সার্চ করতে হবে। এরপর গুগল থেকে পাওয়া লোকেশনের তথ্য অনুযায়ী ম্যাপে সেই জায়গাটি খুঁজে বের করা সম্ভব। এরপর গুগল স্ট্রিটভিউ ব্যবহার করলে সেই জায়গার ছবিও দেখা যাবে। তখন মূল ছবিতে দেখানো স্থানের সাথে স্ট্রিটভিউ-এর ছবি মিলিয়ে দেখা সম্ভব।

ভুয়া ভিডিয়ো ধরার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ভিডিয়ো থেকে ছবির স্ক্রিনশট নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করা। এভাবে ভিডিয়োটি কোত্থেকে এসেছে, সে বিষয়ে ধারণা মেলে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তৈরি ইউটিউব ডেটা ভিউয়ারও ব্যবহার করা যায়। এই টুল ব্যবহার করে ভিডিয়োটি প্রথম আপলোডের সময়সহ নানারকম তথ্য বের করা সম্ভব। আরেক বিকল্প ইনভিড ভিডিয়ো আর ছবি, দুটোতেই কাজ করে। এক্ষেত্রে গুগল ক্রোমে 'ইনভিড অ্যান্ড উইভেরিফাই' (invid & weverify) এক্সটেনশনটি ইনস্টল করে ভিডিয়োটির ওয়েব অ্যাড্রেস ইনভিডের ভিডিয়ো অ্যানালাইসিসে পেস্ট করলে ইউজার আর ভিডিয়োটির তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া ভিডিয়ো স্ক্রিনশট তৈরি করে দেয় ইনভিড, যা দিয়ে গুগল, ইয়ানডেক্স ও টিনআই রিভার্স ইমেজ সার্চ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সম্ভব। কিছু ফ্যাক্ট চেকের জন্য শুধু ইন্টারনেট যথেষ্ট নয়। কখনো সরেজমিনেও কাজ করতে হয়। সার্চ ইঞ্জিনে পর্যাপ্ত তথ্য না মিললে দেশের ভেতরের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় গণমাধ্যমটির প্রতিনিধি কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধি কিংবা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি অথবা টেলিফোন, ইমেইল ও এসএমএস-সহ নানা উপায়ে এর সত্যতা যাচাই সম্ভব।

লেখক: সিনিয়র নিউজ এডিটর, বাংলাভিশন

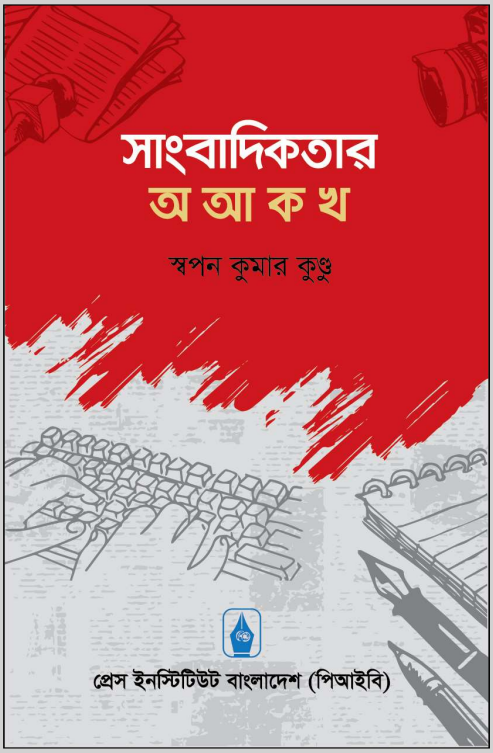

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

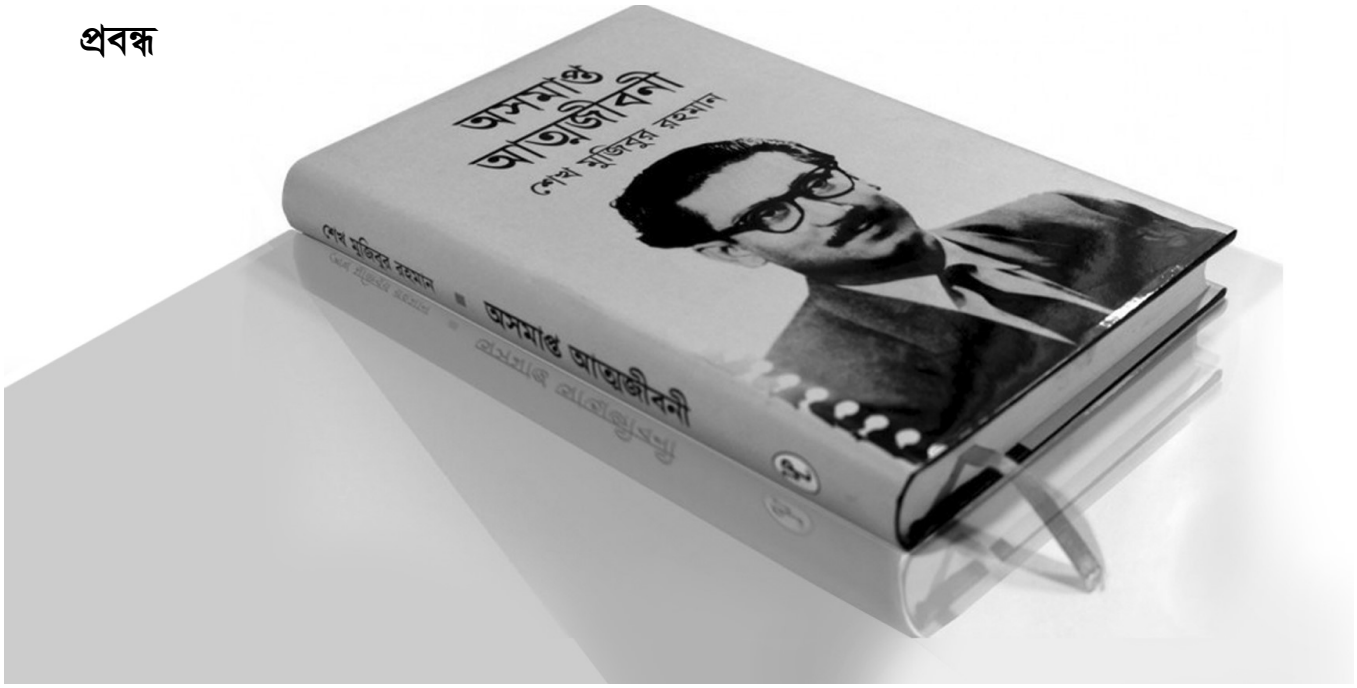

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের আলোকে বঙ্গবন্ধুর মানস

■ মো. ইমরুল কায়েস

সপ্তম শতকের পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পর প্রথম এদেশীয় খাঁটি দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের আলোকে তাঁর মানস নিয়ে লিখতে বসেছি। আমার জন্ম এই মহামানবের কীর্তিমান সময়ের পর। তাঁর জীবন-কর্ম, রেখে যাওয়া আদর্শ আর গ্রন্থ আমার এই লেখার অনুপ্রেরণার উৎস।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত বাংলার স্বাধীনতার সূর্য আবার কবে উদিত হবে, এই অপেক্ষা ছিল প্রায় ২০০ বছর। সাহস আর ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের অভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির নিপীড়ন আর নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিল বাংলার মানুষ।

শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করার খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টা ছিল। সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরাম থেকে তিতুমীরসহ আরও অনেক বীর এসেছেন। নিজেদের রক্ত উৎসর্গ করেছেন মুক্তির সোপানতলে। এরপর সেই সুদিন এলো সেই প্রত্যাশিত নেতার হাত ধরে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক আর মওলানা ভাসানীর সাহচর্যে নিজেকে প্রস্তুত করে অবশেষে তাঁর অমর কবিতা শোনালেন, যার প্রত্যাশায় বাঙালি অপেক্ষা করেছে দীর্ঘ ৮১০ বছর। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সেই অমীয় বাণী–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

অসমাপ্ত আত্মজীবনী রচনার পেছনেও রয়েছে ইতিহাস। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীসহ প্রায় সবাই তাঁকে বলতেন আত্মজীবনী লিখতে। বঙ্গবন্ধু তেমন গুরুত্ব দিতেন না। ১৯৬৭ সালের মধ্যভাগে কোনো একসময় কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা (রেণু) তাঁকে অনুরোধ করেন আত্মজীবনী লিখতে। স্ত্রীর কাছে বঙ্গবন্ধুর সরল স্বীকারোক্তি ছিল এমন–'লিখতে তো পারি না; আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়। আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোন কাজে লাগবে? কিছুই তো পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করেছি।'

অসমাপ্ত আত্মজীবনীর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে একজন খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু, এরপর জাতির পিতায় পরিণত হওয়ার দিনগুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনা। নিজেদের বংশের সোনালি অতীত আর ক্ষয়ে যাওয়া সময়ে টিকে থাকার লড়াই–সবকিছু উঠে এসেছে বইটিতে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রেই। বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষক ইংরেজদের সংঘাত ছিল প্রতিনিয়ত, যা তিনি এই বইয়ে তুলে ধরেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু কারাগারের ছোটো কোঠায় বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা। কীভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, কীভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভ, কীভাবে তিনি কাজ করতে শেখালেন প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভাবনার জগতে সাঁতার কাটছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো লিখতে ভালো না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে পড়ে লিখে রাখতে তো আর ক্ষতি নেই। অন্তত এই বন্দি কারাগারের সময়টুকু কাটবে। এর কয়েকদিন পর বঙ্গমাতা তাঁকে কয়েকটা খাতা কিনে জেল গেটে জমা দিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন আত্মজীবনী লিখতে। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই আত্মজীবনী লিখেননি। নিজের জীবন সম্পর্কে জনসাধারণকে বা বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেকে তুলে ধরার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। শুধু সময় কাটানোর জন্য তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন।

আত্মজীবনী লেখার প্রস্তাবের বিপরীতে তিনি লিখতে পারেন না বলে সরল স্বীকারোক্তি দিলেও তাঁর লেখায় যে সহজ ও সাবলীল ভাষায় সমকালীন ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে, সেটিই প্রমাণ করে তিনি কেবল একটি জাতির স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতাই ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রখর মেধাবী লেখকও।

বঙ্গবন্ধুর এই অমর সৃষ্টি জনমানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার মূলে কাজ করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর অবহেলা আর অনাদরে দীর্ঘ উনত্রিশ বছর অন্ধকারে পড়ে থেকে জীর্ণতায় ভুগছিল যে পাণ্ডুলিপি, সেই অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখল বঙ্গবন্ধুকন্যার মমতার পরশ পেয়ে। বহু কষ্টে জীর্ণতায় অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে তা ২০১২ সালে আমাদের হাতে তুলে দেন গভীর মমতায়।

যে গ্রন্থ বঙ্গবন্ধুকে পাঠ করার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁর নিজ ভাষায়। বইটি আমাদের হাতে সযত্নে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার কাছে। বইটি শুধু বাংলাভাষীর জন্যই নয়, বিশ্বে ১৭টি ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বিশ্বের শতকোটি মানুষ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেছে। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটা বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন সাবলীল ভাষায়। একদম গল্প বলার চালে বলে গেছেন জীবনের সোনালি সেই দিনগুলোর কথা।

বইটি লেখার প্রেক্ষাপট, নিজ বংশপরিচয়, শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক জীবন, সমকালীন আর্থসামাজিক অবস্থা, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দেশবিভাগের প্রেক্ষাপট, দেশবিভাগের যৌক্তিকতা এবং পরিশেষে দেশবিভাগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণে বাঙালি মুসলমানের মোহভঙ্গ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা যায়। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর চীন, ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণও বইটিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

অন্য বিশ্বনেতারা মুক্ত অবস্থায় আত্মজীবনী লিখেছেন; কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম বঙ্গবন্ধুর এ অসমাপ্ত আত্মজীবনী, যা তিনি বন্দিজীবন থেকে লিখেছেন। কোনো পত্রিকা বা বই বা অন্য কারও সহায়তা ছাড়া নিজ মনন আর স্মৃতিশক্তি সম্বল করে আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক অনবদ্য সৃষ্টি। লেখালেখির এ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর আত্মজীবনী কতটুকু ইতিহাসের ধারাবাহী হয়েছে, ঘটনা বর্ণনা কতটুকু হয়েছে অনুপুঙ্খ, তা সামসময়িকদের আত্মজীবনীর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ইতিহাসজ্ঞান ইতিহাসবেত্তাদের মুগ্ধ করে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা তাঁকে অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ার নিভৃত পল্লিতে জন্ম নেওয়া, বেড়ে ওঠা দুরন্ত কৈশোরের সেই খোকা মহাকালের ঘূর্ণিচক্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে নিজেই হয়ে উঠেন ইতিহাসের বরপুত্র। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে নিজ হাতে নিজের জন্ম ইতিহাস রেখে গেছেন আমাদের জন্য। নিজের জন্ম সম্পর্কে অসমাপ্ত আত্মজীবনীর প্রথম পাতায় বলেন, 'আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হলো ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতী নদী। মধুমতী নদী খুলনা ও ফরিদপুরকে ভাগ করে রেখেছে।' ৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, 'আমার জন্ম হয় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তারিখে। আমার আব্বার নাম শেখ লুৎফর রহমান।'

গ্রন্থটি থেকে আমরা এক বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাজীবনের কথা জানতে পারি। সাত বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন তাঁরই ছোটো দাদার প্রতিষ্ঠিত একটি মিডল ইংলিশ স্কুলে, যার নাম ছিল টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন, ফলে হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় তাঁর লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। পিতা শেখ লুৎফর রহমান কলকাতার অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তার দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে চিকিৎসা করিয়েছিলেন এবং কলকাতায় চিকিৎসা করতেই দুই বছর কেটে যায়।

বেরিবেরি থেকে সুস্থ হওয়ার পর তিনি ১৯৩৬ সালে আবার আক্রান্ত হন গ্লুকোমা রোগে। যাতে বঙ্গবন্ধুর চোখ হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। এ সময় তাঁর বাবা গোপালগঞ্জ থেকে মাদারীপুরে বদলি হয়ে যান। তাই বঙ্গবন্ধুকে মাদারীপুর হাইস্কুলে আবারও সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করান। ডাক্তারের পরামর্শে বঙ্গবন্ধুকে আবারও কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার টি আহমেদ বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর চোখ অপারেশনের কথা বলেন। ফলে বঙ্গবন্ধু ভয় পেয়ে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন। চোখ অপারেশন করা হয়। তিনি আবারও সুস্থ হন। কিন্তু ডাক্তার বলেন, লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হবে এবং চশমা ব্যবহার হবে। তখন থেকেই মূলত বঙ্গবন্ধু আজীবন চশমা পরেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল। এরপর আবার মাদারীপুর ফিরে যান। সহপাঠীরা এরই মধ্যে উপরের ক্লাসে উঠে যাওয়ায় তিনি আর মাদারীপুর হাইস্কুলে যাননি। বাবা তাঁকে ১৯৩৭

আত্মজীবনী লেখার প্রস্তাবের বিপরীতে তিনি লিখতে পারেন না বলে সরল স্বীকারোক্তি দিলেও তাঁর লেখায় যে সহজ ও সাবলীল ভাষায় সমকালীন ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে, সেটিই প্রমাণ করে তিনি কেবল একটি জাতির স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতাই ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রখর মেধাবী লেখকও

সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত এ স্কুলেই পড়াশোনা করেন। এরকম বৈচিত্র্যময় শিক্ষাজীবনের প্রমাণ পাই আমরা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে।

বইটিতে বঙ্গবন্ধু নিজ বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মজার ছলেই নিজ বিয়ে সম্পর্কে বইটির সপ্তম পৃষ্ঠায় বলেন, আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে।' গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যখন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার বিয়ে হয়, তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স মাত্র ১২-১৩ বছর আর বঙ্গমাতার তিন বছর।

বঙ্গবন্ধুর জেলজীবনের সূত্রপাত ঘটে ১৯৩৮ সালে কিশোর বয়সে। তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন আব্দুল মালেক নামে। একদিন গোপালগঞ্জের খন্দকার শামসুল হক এসে জানালেন, বঙ্গবন্ধুর সহপাঠী মালেককে হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্যায়ভাবে মারধর করা হচ্ছে। তাই বঙ্গবন্ধু যেন মালেককে উদ্ধার করেন।

এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে যান এবং অনুরোধ করেন যেন মালেককে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মালেককে না ছেড়ে উলটো সুরেন ব্যানার্জি বঙ্গবন্ধুকে গালমন্দ করেন। ফলে বঙ্গবন্ধু এরকম অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানান এবং নিজ দলের ছেলেদের খবর পাঠান। খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধুর মামা শেখ সিরাজুল হক ও শেখ জাফর সাদিক ছুটে আসেন দলবল নিয়ে। দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল মারামারি শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ও তার বন্ধুরা মিলে দরজা ভেঙে আহত মালেককে মুক্ত করে নিয়ে যান। পুরো শহরে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। হিন্দু মহাসভার নেতারা থানায় গিয়ে মামলা করেন। খন্দকার শামসুল হক হন হুকুমের আসামি। অভিযোগ করা হয় বঙ্গবন্ধু ছুরি দিয়ে সুরেন ব্যানার্জিকে হত্যা করতে তার বাড়িতে হামলা চালায়।

পরদিন বঙ্গবন্ধু জানতে পারেন তাঁর দুই মামাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকেও গ্রেফতার করতে চায় পুলিশ; কিন্তু তাঁর বাবার জন্য গ্রেফতার করতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ, তাঁর বাবাকে এলাকার সবাই সজ্জন হিসাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। গ্রেফতারে বিলম্ব হলে কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুকে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি পালাব না। পালালে লোকে বলবে আমি ভয় পেয়ে পালিয়েছি।' এই ভাষ্য অকুতোভয় বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। পরে পুলিশ বঙ্গবন্ধুর বাড়ি এসে তাঁর বাবাকে গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখালে তিনি পুলিশকে বলেন, ওকে নিয়ে যান। দারোগা বাবু উত্তরে নরম সুরে বলেন, ও বরং খেয়েদেয়ে আসুক। সত্যি সততার প্রমাণ দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি খাওয়া শেষ করে হাজিরা দেন।

১৯৩৮ সালে ছাত্রাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় উপমহাদেশের রাজনীতির দুই মহিরুহ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। তিনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ১১ পাতায় লিখেছেন, 'হক সাহেব ও শহীদ সাহেব এলেন, সভা হলো। এগজিবিশন উদ্বোধন করলেন। শান্তিপূর্ণভাবে সকল কিছু হয়ে গেল। হক সাহেব পাবলিক হল দেখতে গেলেন আর শহীদ সাহেব গেলেন মিশন স্কুল দেখতে। আমি মিশন স্কুলের ছাত্র। তাই তাঁকে সংবর্ধনা দিলাম। তিনি স্কুল পরিদর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম এবং বাড়ি কোথায়। একজন সরকারী কর্মচারী আমার বংশের কথা বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন–তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই? বললাম, কোন প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও নাই।

তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।'

১৯৪৩ সনের ভয়াবহ মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ খুব কাছ থেকে দেখেছেন বঙ্গবন্ধু। তখন বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের এদেশীয় সম্পদ যুদ্ধে ব্যবহার ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বাংলার শাসনতন্ত্রে পরিবারতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ফলে সাড়া বাংলায় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে তিনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখেন, 'খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ঢাকার খাজা বংশ থেকেই ১১ জন এমএলএ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি তাঁর ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেবকে শিল্পমন্ত্রী করলেন। আমরা বাধা দিলাম তিনি শুনলেন না।

শহীদ সাহেবের কাছে আমরা যেয়ে প্রতিবাদ করলাম, তিনিও কিছু বললেন না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হয়েছেন। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা তা গুদামজাত

করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই যে রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় নাই।'

এ সময়ে বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ান বঙ্গবন্ধু। তিনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ১৮নং পৃষ্ঠায় লিখেন, 'এ সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলো লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসায় এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম।'

ইংরেজদের কাছে ক্ষমতা হারানো মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব এবং হিন্দুদের মুসলমানদের স্থলে নিয়োগ মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে দিয়েছিল। ক্ষমতা হারানোর পর ভারতবর্ষের মুসলমানরা প্রায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। ইংরেজদের ঘৃণা করার পাশাপাশি তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও ঘৃণা করত। এই সুযোগে হিন্দুরা দলে দলে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগ পেয়ে রাতারাতি উন্নতি করতে লাগল। মুসলমানদের কাছ থেকে জমিদারি কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের দিয়ে দেওয়া হলো।

ক্ষমতা পেয়ে হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার শুরু করল। ফলে সমাজে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ বাড়তে থাকল। ফলে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ডের দাবি উঠল। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম।' এ কারণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ-পরবর্তী সময়ে লাহোর প্রস্তাব এবং এর ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যদিও লাহোর প্রস্তাবে ভিন্ন ভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল; কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে দুটি ভিন্ন প্রান্তে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম নিল।

পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষার ওপর প্রথম আঘাত আসে যখন করাচিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে পাকিস্তান সংবিধান সভার বৈঠক হচ্ছিল। বেশির ভাগ মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত দেন। একমাত্র কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা বাংলা। মুসলিম লীগ সদস্যরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।

এজন্য পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমুদ্দীন মজলিস এর প্রতিবাদ করে দাবি করল বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমুদ্দীন মজলিস রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করল এবং সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে বাংলাভাষা দাবি দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বঙ্গবন্ধু-সহ সব নেতাকর্মী জেলায় জেলায় বের হন। এই দাবির পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে ১১ মার্চ শামসুল হক, বঙ্গবন্ধু-সহ অনেক নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। পরে ১৫ মার্চ মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভূমিকা বিষয়ে একশ্রেণির লেখক যে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এর জবাব বঙ্গবন্ধু নিজেই দিয়ে গেছেন, '১৬ তারিখ সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসলো সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল।' (রহমান, শেখ মুজিবুর, ২০১২, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৬, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

ভাষা আন্দোলনের লেখক-গবেষক বদরুদ্দীন উমর এ ঘটনাকে উল্লেখ করে উপহাসের ভাষায় লিখেছেন, '১৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা দেড়টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরোয়ানী এবং জিন্নাহ টুপি পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন।' (উমর, বদরুদ্দীন, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮২-৮৩)।

১৯৪৮ সালের এই প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলনের প্রধান ছাত্রনেতাদের মধ্যে অন্যতম নেতা ছিলেন অলি আহাদ। তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমরা ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ সভা আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন।' (আহাদ, অলি, জাতীয় রাজনীতি, পৃ. ৫৯)।

যদি ছাত্রসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্ব করার কথা না থাকত তবে অলি আহাদ সেটা লিখতেন না। কারণ, অলি আহাদ আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুকে শত্রু মনে করে গেছেন। অথচ উমর সাহেবরা অসত্য ইতিহাস লিখে গেছেন প্রথম ভাষা আন্দোলন নিয়ে, অসমাপ্ত আত্মজীবনী বের হওয়ার পরও এটা সংশোধন করেননি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাদের লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাকে অর্থমন্ত্রী করার ফলে আমলাতন্ত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর সাথে সাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল হয়ে একটা শক্তিশালী সরকারী কর্মচারী গ্রুপ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারী ছিলেন। সত্যিকার ক্ষমতা তিনিই ব্যবহার করতেন। নূরুল আমিন তার কথা ছাড়া এক পাও নড়তেন না।' (রহমান, শেখ মুজিবুর, ২০১২, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৭৪)।

ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি ছোটো বই লিখেছিলেন। এতে তিনিও স্বীকার করেছেন, ব্রিটিশ আমলের সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের কিছু উচ্চাভিলাষী লোক, কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খানের ইন্তেকালের পর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অন্যত্র–পল্টনের জনসভায় (১৯৫২ সালের) তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে–এটাও ছিল আমলাদের একটা চাল।' (আমিন, নুরুল: যে কথা এতোদিন বলিনি, পৃ. ৩)।

পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য নিয়ে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মজীবনীতেও অনেক কথা বলেছেন, যা বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত তথ্যের পরিপূরক। তিনি লিখেছেন, "তিনি (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী) মি. কেরামতুল্লাহর বদলে মি. আজিজ আহমদকে বাণিজ্য দফতরে সেক্রেটারি নিযুক্ত করলেন। মি. আজিজ আহমদ শুধু সর্বজ্যেষ্ঠ আইসিএসই নন, মোস্ট স্টিফনেকেড ব্যুরোক্র্যাট' বলিয়া তাঁর বদনাম বা সুনাম আছে। মন্ত্রীদের কোনো কথা তিনি শোনেন না। মন্ত্রীদের তিনি কানি আঙ্গুলের চারিপাশে ঘুরান। পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারী থাকা অবস্থায় তিনি হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন–আমি প্রধানমন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল রাখি। লোকে বলাবলি করিত আসলে চিফ সেক্রেটারিই পূর্ব বাংলার প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী।" (আবুল মনসুর আহমদ: আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫)।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন মাতৃভাষা বাংলার ওপর আঘাত এলো, তখন তিনি ভুল বুঝতে পারলেন। পাকিস্তানিদের নব্য উপনিবেশবাদের বিরোধিতায় দিনের পর দিন কারাবরণ করেছেন। বছরখানেকের মধ্যেই পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপ্ন ভঙ্গ হয়

পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাতন্ত্রের অপতৎপরতার দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে। বঙ্গবন্ধু যদিও এই বই লেখার সময় লাইব্রেরির সহায়তা নিতে পারেননি, নিজ স্মৃতিশক্তি থেকে লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যারা এ বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তাঁদের গ্রন্থের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধুর বইটিতে কোনো তথ্যের অসামঞ্জস্য বা ঘাটতি নেই।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, বাংলার মুসলমানদের দুর্দশা দেখে প্রথম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রভাগেই ছিলেন তিনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা থেকে কলকাতা, বিহার, দিল্লি, পাঞ্জাব, পেশোয়ারসহ তদানীন্তন সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোয় বিভিন্ন সভা করে বেড়িয়েছেন। স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করেছেন। কারাবরণ করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন মাতৃভাষা বাংলার ওপর আঘাত এলো, তখন তিনি ভুল বুঝতে পারলেন। পাকিস্তানিদের নব্য উপনিবেশবাদের বিরোধিতায় দিনের পর দিন কারাবরণ করেছেন। বছরখানেকের মধ্যেই পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তখন থেকেই পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের নানা অন্যায়-অবিচার আর বৈষম্যের প্রতিবাদ করেন। ফলে যৌবনের সোনালি সময়গুলো কারান্তরিন থাকেন। নিজের সন্তানদের কাছে সময় দিতে না পারায় তাদের কাছে তিনি যেন এক অচেনা পিতায় পরিণত হন। এ নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'একদিন সকালে আমি আর রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর আব্বা আব্বা বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনা কে বলছে–হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।

আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, আমি তো তোমারও আব্বা। কামাল আমার কাছে আসতে চাইতো না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম এখন ও আর সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেকদিন না দেখলে ভুলে যায়। আমি যখন জেলে যাই, তখন ওর বয়স কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।' (রহমান, শেখ মুজিবুর, ২০১২, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২০৯, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

মানুষ, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির মুক্তির জন্য জীবনের কতগুলো বসন্ত জেলখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে স্বজনহীন কাটিয়েছেন, উপরিউক্ত লেখায় তাঁর বুকফাটা আর্তনাদ আমরা দেখতে পাই।

গ্রন্থটিতে গোপালগঞ্জের ডানপিটে সাহসী সমাজসচেতন কিশোর শেখ মুজিবের পরিণত বলিষ্ঠ নেতা হওয়ার আভাস মেলে। কিন্তু সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার গল্প আমরা দেখতে না পেলেও বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার একটা রূপান্তর প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ করি। আমরা তাঁর রাজনৈতিক দর্শন আর উপলব্ধির সঙ্গে, তাঁর চেতনা আর স্বপ্নের সঙ্গে, তাঁর বোধ আর বোধের বিবর্তনরেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠি। কোনো রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট বা বিশাল প্রভাবশালী ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নেননি তিনি।

গ্রামের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন কীভাবে হয়ে উঠলেন সমগ্র বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক? যেসব নেতার কাছ থেকে রাজনীতির পাঠ নিয়ে কিশোর মুজিব উঠে এসেছেন ধীরে ধীরে, মঞ্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে কীভাবে তিনি তাদের ছাড়িয়ে গেলেন? কীভাবে হয়ে উঠলেন নেতাদের নেতা? সাম্প্রদায়িকতাকে উপজীব্য করে শুরু হয়েছিল যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের কর্মী হিসাবে যাঁর রাজনৈতিক উত্থান, তিনি কীভাবে ও কেন হয়ে উঠলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলার গণমানুষের নেতা?

শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি করেছেন মূলত মানুষের জন্য। আর কিছু বোঝা না গেলেও এটুকু অন্তত বুঝতে পারা যায় এই তিনশ পৃষ্ঠার ছোট্ট অথচ গভীর বইটি পাঠ করে। যেহেতু গণমানুষের জন্য তাঁর রাজনীতি ছিল, এ কারণে কোনো পিছুটান তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। স্বার্থের জন্য আপসের মনোভাব ছিল না। পারিবারিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার দায়ও ছিল না, যা করেছেন নিজে বিশ্বাস করে হৃদয় থেকে করেছেন। তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি পালানোর রাজনীতি বা গোপন রাজনীতি পছন্দ করেন না। এ কারণে বারবার কারাবরণ করেছেন; কিন্তু সুযোগ পাওয়ার পরও পালিয়ে যাননি। বিভিন্ন আন্দোলনে অনেক বরেণ্য নেতা আত্মগোপনে গেলেও সহযোদ্ধাদের ছেড়ে কখনোই পালিয়ে যাননি।

পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু সেই আন্দোলনের ফসল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একেবারে শুরু থেকেই তিনি বারবার কারাবন্দি হন। ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারেন যেজন্য তিনি আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, তা পাননি বরং সাদা চামড়ার বদলে কালো চামড়ার শোষণ পেয়েছে জনগণ। দেখলেন শাসকের নাম বদলেছে, রং বদলেছে; কিন্তু চরিত্র বদলায়নি। যাদের সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন, তাদের অনেকেই ক্ষমতা আর লালসার কারণে তাঁর ও তাঁর সমমনাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত শুরু করেছে।

তিনি বরাবরই শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দর্শনে সাম্যের কথা এসেছিল সমাজতন্ত্র হিসাবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন

পুঁজিবাদী অর্থনীতি দর্শনগতভাবেই মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী। আর এ কারণেই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমি নিজে কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র মনে করি। এ পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন দুনিয়ার মানুষের ওপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা।

যুগ যুগ পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে, তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া এবং জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

যে কোনো অবিচার আর অন্যায়ের বিরোধিতায় বঙ্গবন্ধু সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। যেমন দাওয়ালদের বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই সময় খাদ্য সমস্যা দেখা দিল কয়েকটা জেলায় বিশেষ করে ফরিদপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার জনসাধারণ এক মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। সরকার কর্ডন প্রথা চালু করেছিল। এক জেলা হতে অন্য জেলায় কোন খাদ্য যেতে দেওয়া হত না। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লোক, খুলনা ও বরিশালে ধান কাটবার মরশুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসেবে যেত। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত। পরিবর্তে একটা অংশ পেত। এদের দাওয়াল বলা হত। হাজার হাজার লোক নৌকা করে যেত।

আসবার সময় তাদের অংশের ধান নিজেদের নৌকায় করে বাড়িতে নিয়ে আসত। এমনি ভাবে কুমিল্লা জেলার দাওয়ালরা সিলেট জেলায় যেত। এরা প্রায় সকলে গরিব ও দিনমজুর। প্রায় দুই মাসের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে এদের যেতে হত। যাবার বেলায় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সংসার খরচের জন্য দিয়ে যেত। ফিরে এসে ধার শোধ করতো। দাওয়ালদের নৌকা খুবই কম ছিল। যাদের কাছ থেকে নৌকা নিত তাদেরও একটা অংশ দিতে হত। যখন এবার দাওয়ালরা ধান কাটতে গেল, কেউ তাদের বাধা দিল না। এরা না গেলে আবার জমির ধান তুলবার উপায় ছিল না। এক সাথেই প্রায় সব ধান পেকে যায়, তাই তাড়াতাড়ি কেটে আনতে হয়। স্থানীয়ভাবে এতো কৃষাণ একসাথে পাওয়া কষ্টকর ছিল। বহু বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতি চলে আসছিল।

ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার হাজার হাজার লোক এই ধানের উপর নির্ভর করত। দাওয়ালরা যখন ধান কাটতে যায় সরকার কোন বাধা দিল না। যখন তারা দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগ নৌকায় তুলে রওয়ানা করল বাড়ির দিকে তাদের বুভুক্ষু মা-বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার জন্য, যারা পথ চেয়ে আছে, আর কোনো মতে ধার করে সংসার চালাচ্ছে–কখন তাদের স্বামী, ভাই, বাবা ফিরে আসবে ধান নিয়ে, পেট ভরে কিছুদিন ভাত খাবে, এই আশায়–তখন নৌকা রওয়ানার সাথে সাথে তাদের পথ রোধ করা হল। ধান নিতে পারবে না, সরকারের হুকুম, ধান জমা দিয়ে যেতে হবে, নতুবা নৌকা সমেত আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে। সহজে কি ধান দিতে চায়? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ধান নামিয়ে রেখে লোকগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এখবর পেয়ে আমার পক্ষে চুপ থাকা সম্ভব হল না। আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম। সভা করলাম, সরকারী কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম কিন্তু কোন ফল হল না। অনেক সভা-সমিতি, অনেক প্রস্তাব করলাম কোন কাজ ফল হল না।'

এভাবে দাওয়ালদের জন্য সংগ্রাম করলেন বঙ্গবন্ধু। সংগ্রাম করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনার জন্য, যে কারণে নিজের ছাত্রত্ব পর্যন্ত হারিয়েছেন। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি প্রধানত শোষণমুক্ত ও বৈষম্যমুক্ত একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতেন। ১৯৫২ সালে তিনি চীন ভ্রমণের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রের পার্থক্য উপলব্ধি করেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল তাদের জনগণ জানতে পারল এই দেশ ও এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউ নন।' (রহমান, শেখ মুজিবুর, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২০১২, পৃ. ৩৩৪, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শোষণমুক্তি ও বৈষম্যদূরীকরণে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। চীনে গিয়ে তাঁর এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।

তিনি দেখতে পান কীভাবে চীনে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে, ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হয়েছে–'আজ চীন দেশ কৃষক-মজুরের দেশ। শোষক শ্রেণী শেষ হয়ে গেছে। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে রাষ্ট্র কিভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রাপ্তির মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করেছে।' (রহমান, শেখ মুজিবুর, ২০১২, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৩০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের একটি অন্যতম ভিত্তি হলো অসাম্প্রদায়িক চিন্তা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও এটি অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা আর বাঙালি জাতিয়তাবাদ যেন একই সূত্রে গাঁথা।

এটি সত্য–বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়সে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে বেশ জোরালোভাবে শামিল ছিলেন। পাকিস্তানের সমর্থনে চষে বেড়িয়েছেন সমগ্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা।

জনসাধারণের দুঃখ লাঘব করতে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে কাজ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে তিনি সুষম খাদ্য বণ্টনের আন্দোলন, ভুখা মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তরুণ মুজিব ছুটে চলেন দাঙ্গাকবলিত মুসলিম, হিন্দু দুই জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়–'দু-এক জায়গায় উদ্ধার করতে যেয়ে আক্রান্তও হয়েছিলাম। আমরা হিন্দুদের উদ্ধার করে হিন্দু মহল্লায় পাঠাতে সাহায্য করেছি। মনে হয়েছে মানুষ তার মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৬৬)। কলকাতায় তিনি হিন্দু, মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ফিরিয়ে আনতে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দীর এই প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুও যুক্ত হন। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বঙ্গবন্ধু প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই যে কোনো ইস্যুতে ভারত আর ইসলাম ধ্বংসের জুজু দেখানো শুরু হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি করে মানুষ হত্যার পর সরকার থেকে বলা হয়, কলকাতা থেকে হিন্দু ছাত্ররা এসে পায়জামা পরে আন্দোলন করছে। ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেন পাকিস্তান আসলে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

তিনি দুঃখ করেই বলেন, 'দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেছিল, এখন তারা পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার ধুয়া তুলে রাজনীতিকে তারাই বিষাক্ত করে তুলেছে। মুসলিম লীগ নেতারাও কোনোরকম অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক প্রোগ্রাম না নিয়ে যে শ্লোগানে ব্যস্ত রইল তা হল ইসলাম। অবাক লাগে ধর্ম বেঁচে

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ করলে আমরা এতে সহজ ভাষায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ছাপ দেখতে পাই। যে কোনো পাঠক যখন এ গ্রন্থটি পাঠ করবে, তার মানসে ভেসে উঠবে ওই সময়ের প্রতিচ্ছবি। যেন প্রতিটি ঘটনায় পাঠক নিজে সাক্ষী–এমন এক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে পাঠকমনে। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু কোনো রাখঢাক রাখেননি

যারা মূলত জীবনধারণ করে, তাদের চারিত্রিক গুণাবলি এত বছর পরও বদলায়নি।' যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যকার নির্বাচনের সময় বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তার সঙ্গে টেক্কা দিতে না পেরে এখনকার মতোই ধর্মের ট্রাম্পকার্ড খেলার চেষ্টা করে মুসলিম লীগ।

বঙ্গবন্ধুর ভাষায়–'মুসলিম লীগ যখন দেখতে পেল তাদের অবস্থা ভালো না, তখন এক দাবার ঘুঁটি চাললেন। অনেক বড় আলেম, পীর ও মাওলানা সাহেবদের হাজির করলেন। এক ধর্মসভা ডেকে ফতোয়া দিলেন আমার বিরুদ্ধে যে, আমাকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। সাথে শর্ষিনার পীর সাহেব ও বরগুনার পীর সাহেব সবাই আমার বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং যত রকম ফতোয়া দেওয়া যায় তা দিতে কৃপণতা করলেন না।' কিন্তু বাংলার মানুষের জন্য কাজ করতে করতে তিনি বুঝতে পারেন বাঙালিকে এভাবে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। রাজনীতির মাঠে যারা কিছুই করতে পারেননি, তিনি তাদের অনুসরণ করেননি। তিনি অনুসরণ করেছেন উপমহাদেশে কিংবদন্তিতুল্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। তিনি কাজ করতে করতে শিখেছেন। ভুল হলে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'আমার যদি কোন ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষেরই হয়ে থাকে।'

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ করলে আমরা এতে সহজ ভাষায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ছাপ দেখতে পাই। যে কোনো পাঠক যখন এ গ্রন্থটি পাঠ করবে, তার মানসে ভেসে উঠবে ওই সময়ের প্রতিচ্ছবি। যেন প্রতিটি ঘটনায় পাঠক নিজে সাক্ষী–এমন এক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে পাঠকমনে। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু কোনো রাখঢাক রাখেননি।

তিনি গ্রন্থটিতে বিভিন্ন জায়গায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে এক সভার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন–"তিনি আনোয়ার সাহেবকে একটা পদ দিতে বললেন। আমি বললাম কখনোই হতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোটারী করেছে, ভালো কর্মীদের জায়গা দেয় না। কোন হিসাবনিকাশ কোনদিন দাখিল করে না। শহীদ সাহেব আমাকে বললেন, 'Who are you? You are nobody.' আমি বললাম, If I am nobody, then why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank You, sir. I will never come to you again."

অবাক হয়ে ভাবতে হয় কতটুকু আত্মবিশ্বাস থাকলে একটা ছোট্ট মহকুমার সামান্য কিশোর রাজনীতিবিদ সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতার সামনে এভাবে নিজের মতামত দিতে পারেন। পশ্চিম পাকিস্তানি তথা অবাঙালিদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু একমাত্র জিন্নাহর প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা ছিল। বাকি অধিকাংশ অবাঙালি নেতা মূলত স্বার্থান্বেষী আর ক্ষমতালিপ্সু মনোভাবই ফুটে উঠেছে লেখার বিভিন্ন অংশে। ধীরে ধীরে সম্ভবত তিনি এটাও বুঝতে পারছিলেন, যারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধামাধরা মূলত ক্ষমতার রাজনীতি করেন, তারাই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। বিশেষ করে চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় নেজামে ইসলাম পার্টির নেতাদের ক্ষমতালিপ্সু আদর্শহীন মনোভাব তাঁকে পীড়িত করে। কিন্তু এসব শিক্ষাই তাঁকে ধীরে ধীরে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির গুরুত্ব আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তিনি মূল্যায়ন করেছেন এভাবে–'এই নির্বাচনে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, জনগণকে ইসলাম ও মুসলমানের নামে স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানগণ তাঁদের ধর্মকে ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবে না।' সেই সময়ের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, যাঁকে তিনি মওলানা সাহেব হিসাবে সম্বোধন করেছেন, তাঁর প্রতি বিভিন্ন স্থানে ভরসা আর শ্রদ্ধার প্রকাশ থাকলেও তাঁর কিছু কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর বিরক্তিও চাপা থাকেনি। তিনি লিখেছেন, 'মাওলানা ভাসানীর এই দরকারের সময় আত্মগোপনের মনোভাব কোনোদিন পরিবর্তন হয় নাই।' আর একজন সামান্য এক মহকুমার কিশোর রাজনীতিবিদ থেকে হাতে-কলমে কাজ করে, ভুল করতে করতে নিজেকে শুধরে নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন গণমানুষের নেতা, সমগ্র বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

তথ্যসূত্র

* রহমান, শেখ মুজিবুর, ২০১২, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, প্রথম সংস্করণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
* উমর, বদরুদ্দীন, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, সুবর্ণ।
* আহাদ, অলি, জাতীয় রাজনীতি, বাংলাদেশ কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড।
* আমিন, নুরুল, যে কথা এতো দিন বলিনি।
* রহমান, অধ্যাপক ড. মীজানুর, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মানস ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি, www.jagonews24.com, ১৪ আগস্ট ২০২০।
* হান্নান, ড. মোহাম্মদ, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তুলনামূলক আলোচনা, www.kalerkantho.com, ২১ আগস্ট ২০২১।
* কামাল, মোহিত, লেখক শেখ মুজিবুর রহমানের সাহিত্যসত্তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, www.dactarprotidin.com, ৩০ আগস্ট ২০২২।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী

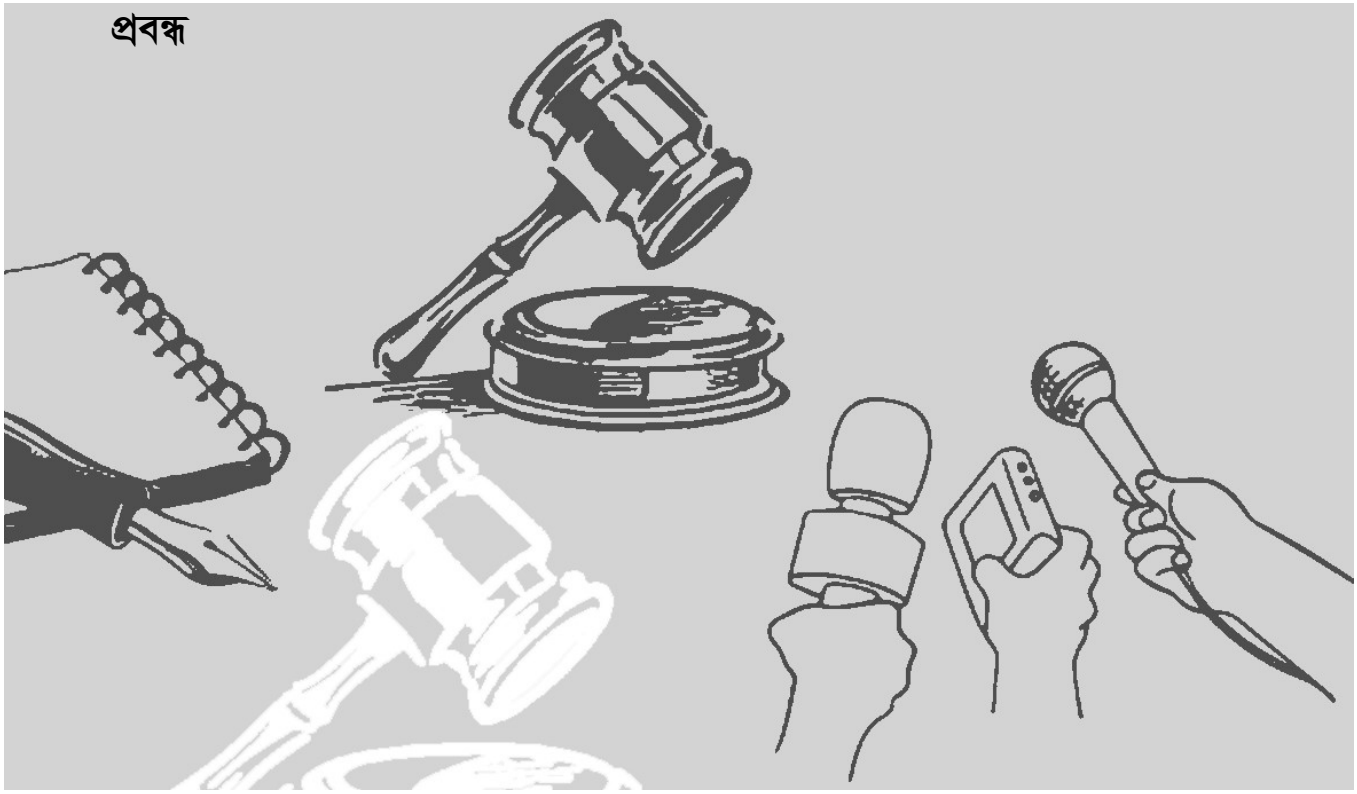

তথ্যের ভার বহিবার শকতি

■ জাফর ওয়াজেদ

তথ্যের ভার বহিবার শকতি সবার সমান নয়। থাকার কথাও নয়। আর যদি থাকে, তবে সে তথ্য ভারবাহী হওয়ার নয়। তথ্যের নিজস্ব শক্তিমত্তা, ওজন, ক্ষমতা রয়েছে। যা তাকে পরিচালিত করে তথ্য গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে। তথ্য মানে নিছক বস্তু বা সংবাদের তালিকা নয়। তথ্য ও সত্য এবং তথ্য ও জ্ঞান–এর মধ্যে রয়েছে নানারকম দার্শনিক পার্থক্য বা হেরফের। ব্যক্তি অনুভবের রঙে রঙিন হয়ে যখন প্রকাশিত হয় তথ্য–ভাষায় বা চিত্রকলাতে, কিংবা ছবিতে অথবা সংগীতে বা অন্যান্য শিল্পে, তখন তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। আবার দেখা যায়, তথ্য যেখানে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন কিংবা খণ্ডিত, সেখানে জ্ঞান তথ্যগুলোকে সংহত করে এবং শৃঙ্খলা দেয়। জ্ঞান তথ্যের আগে-পরে ক্রমানুসারে, গুরুত্বের বিন্যাসে, গ্রহণ-বর্জনের শর্ত ইত্যাদির ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেয়। এমনকি তথ্য ও অতথ্যের মধ্যে, সত্য ও অসত্যের মধ্যে তফাত করতে শেখায়। তথ্যের অধিকার যেমন চাওয়া হয়, তেমনই সেই অধিকারের মহৎ দায়টিকেও স্বীকার করতে হয়। অসম্পূর্ণ তথ্য, ভেজাল মেশানো তথ্য, এমনকি ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অভিসন্ধিপ্রসূত অতথ্যের জঞ্জাল ও মিথ্যার আস্তাকুঁড় থেকে যথার্থকে উদ্ধার করার দায় সত্য তথ্যের। জনগণ তো চাইবেই তথ্যের অধিকার রাষ্ট্রজীবন, সমাজজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনেও পরিব্যাপ্ত হোক।

তথ্য শব্দটির মূলে আছে 'তথা' শব্দটি। তথ্য মানে 'যা তা-ই' অথবা যেমনটা তেমনটা। তথ্য শব্দের আরেক অর্থ 'সত্য'। তাই তথ্য শুধু প্রদান ও গ্রহণ করলেই হবে না। তাকে সত্য বা যথাযথ হতে হবে। এটা অনস্বীকার্য যে, তথ্যের অধিকার গণতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে অবশ্য জরুরি। আর তাই এই অধিকার সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছানো সংগত। কারণ, জনগণই এর ভোক্তা। যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব নাগরিকের স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং পছন্দ করার সমান অধিকার রয়েছে। মানুষ চেষ্টা করে যত বেশি সম্ভব নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার। এবং এর ভিত্তিতেই সে যথাসম্ভব সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও বিস্তারের ফলে জনগণের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। তথ্যের সহজলভ্যতাও তাকে এ বিষয়ে আরও আগ্রহী করেছে একালে, এটা অনায়াসে বলা যায়। অবশ্য তথ্যের অভিগমন মূলত নির্ধারিত হয় তথ্যের নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে রয়েছে, কারা ব্যবহার করতে চাইছেন তার দ্বারা।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তথ্য কারা সংগ্রহ করছে, কেন করছে, কীভাবে করছে? অর্থাৎ তথ্যের নির্মাণেও একধরনের উদ্দেশ্য কাজ করে। তথ্য জেনে কী হবে, যদি তথ্য মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা না করে। যদি তথ্য জনগণের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায়? পাশ্চাত্যে যেমন নতুন নতুন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যবস্থা নেওয়াটাই প্রথা। আর সেসব দেশে যেহেতু মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর ব্যবস্থা অনেক আগেই কার্যকর হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তথ্য যদি জনগণকে বাঁচতে সহায়তা না করে, যদি তথ্য জমতে জমতে পাহাড়ে পরিণত হয়, তবে সেই তথ্যের পাহাড় ডিঙানো হয়ে যায় শ্রমসাধ্য। তাহলে সেই তথ্যের অধিকার মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে? আমাদের মতো দেশে এই প্রশ্নটা জরুরি। যারা গবেষক, সেমিনারে ভাষণ দেন, সেই একাডেমিকদের জন্য তথ্য অবশ্যই একটা বড়ো হাতিয়ার। কিন্তু নিরক্ষর বুভুক্ষু গ্রামবাসীর কাছে তথ্যের বার্তা কোন কাজে লাগতে পারে, তা ভালোই জানা।

নোবেল বিজয়ী বাঙালি অমর্ত্য সেন বলে আসছেন, 'তথ্যের সরবরাহ ছিল না বলেই এককালে দুর্ভিক্ষ হতো। এখন হয় না। দুর্ভিক্ষ না হয় ব্যাপক আকারে হচ্ছে না, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে অনাহারে মানুষের মৃত্যুর খবর তো সংবাদপত্র মারফত জানা যাচ্ছে।' এটা তো ঠিক যে, তথ্য সংগ্রহ করে আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে মানুষের চোখের আড়ালে রাখা যায়। কিন্তু তাতে লাভ কী? গ্রামের দরিদ্র মানুষ যদি গ্রাম বা ইউনিয়নের কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে জানতে চাইতে পারেন, সেখানে তিনি কী ওষুধ খেতে পারেন, তাহলে সেই তথ্য স্পষ্ট করে গ্রামের মানুষের আঞ্চলিক বা নিজস্ব ভাষায় দিতে হয়। যাতে বুঝতে পারে। এমন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা গেলে তথ্যের অধিকার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এটা বিচ্ছিন্ন একটা বিষয় হলেও নগরজীবনের বিভিন্ন স্তরে এর প্রসার ঘটানো যায়।

দার্শনিক মিশেল ফুকো বলেছেন, "দেখতে হবে কে 'ডিসকোর্সকে' নিয়ন্ত্রণ করছে। এক্ষেত্রেও দেখার দরকার তথ্যকে কে নিয়ন্ত্রণ করছে। কী উদ্দেশ্যে তা কাজে লাগানো হচ্ছে।" তাই বলা যায়, তথ্যের অধিকারই বড়ো কথা নয়। দেখতে হবে তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে, কারা সংগ্রহ করছে, কেন সংগ্রহ করছে। এটা বাস্তব যে, তথ্যসমৃদ্ধ মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভালোভাবে অংশ নিতে পারে। তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিক, গণমাধ্যম ও সংসদ সরকারের পদক্ষেপগুলোকে যথার্থভাবে অনুসরণ ও বিচার করতে সক্ষম হয়। সাধারণ নাগরিকের অধিকার তথ্য চাওয়া। রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্নয়ন এজেন্ডার নিশ্চয়তা দেয় তথ্য অধিকার আইন। দেশের বেশির ভাগ আইন তৈরি করা হয় জনগণের ওপর প্রয়োগ করার জন্য। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন এমন আইন, যা জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করে থাকে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হলে এটা তো স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রযন্ত্রেরও সব স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি হ্রাস পায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে সে পথে এগোতে হচ্ছে। তথ্যের অধিকারের সঙ্গে জবাবদিহির সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন বলা যায়। আবার জবাবদিহির প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী হয় না। কারণ, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া জনগণের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। সরকারি স্তরের তেমন গোপনীয়তা জনগণের দায়বদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। এই গোপনীয়তার ফলে পুরোনো পদ্ধতিকে হালনাগাদ বা পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোগ করার সব ধরনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। সরকারি কর্মচারীরা এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, যা অনেক মানুষের জীবন ও স্বার্থকে প্রভাবিত করে। যথাযথ তথ্যের প্রবাহ তাদের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করে তোলে। তার মাধ্যমে আসলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য জানার অধিকার অন্য অধিকার প্রয়োগের ভিত হিসাবে কাজ করে। গণতান্ত্রিক এই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র নির্ভর করে জনগণের গণতান্ত্রিকতায়, গণতান্ত্রিক ভাবনায়, গণতন্ত্র প্রয়োগে। আর গণতন্ত্র প্রয়োগ হয় সরকারি ব্যবস্থার বাইরে থেকে অংশগ্রহণে। যেমন: সরকার যা করছে, তা জানতে চাওয়া, প্রশ্ন করা। সিদ্ধান্ত নেওয়া, মত তৈরি করা, প্রতিবাদ করা। সরকারকে তার দায়দায়িত্ব মনে করিয়ে দেওয়া, চাপে রাখা। এসবের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জনক্ষমতার ধারণা তৈরি হয়। সরকারি গণতন্ত্রের মধ্যে তালমিলিয়ে জনগণের গণতন্ত্রের একটা চরিত্র তৈরি করা যায়। এ কারণেই তথ্য দেওয়াটা সরকারের দয়ার কাজ নয়, সরকার তথ্য দিতে বাধ্য। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রী দেশ নয়। বরং গণপ্রজাতন্ত্রী। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের সজাগ থাকতে হয়। এতে দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের পরস্পর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। কর্মীদের ওপর কাজের চাপও বাড়ে। তথ্য সরবরাহের দায়িত্বের কারণে পুরো দপ্তর সক্রিয় হয়। তা ইতিবাচক কর্মকাণ্ড বলে বিবেচিত।

এটা অনেকে মনে করেন, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আইন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রগতির একটি নিশ্চিত পদক্ষেপ। তথ্য জানার অধিকার বাংলাদেশের জনগণের অধিকার তালিকায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আইন সাদা না কালো, তা নির্ভর করে প্রয়োগের ওপর। আইন বড়ো নয়, আইনের প্রয়োগটাই বড়ো। তথ্য অধিকার আইন সম্পূর্ণ সাদা। জনগণের অধিকার সংবলিত আইন। তাই তথ্য অধিকার আইনের অনুপস্থিতি মানে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি। সেই সঙ্গে সুশাসনের, যা দুর্নীতির প্রসার ঘটায়। যার পরিণতিতে অপচয় হয় প্রচুর সম্পদের। অমর্ত্য সেন এ কথাটি স্পষ্ট করেছেন তাঁর ভাষ্যে যে, দুর্নীতি রোধ করার জন্য গণতন্ত্রই একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতন্ত্রে স্বচ্ছতার গুরুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর স্বচ্ছতাকে মর্যাদা দিতে গেলে তথ্যের অধিকার থেকে নাগরিককে বঞ্চিত করে রাখা যায় না। কারণ, নাগরিকের পছন্দকে তথ্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মানুষের মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতা ও সমষ্টির মঙ্গল চিন্তা থেকেই গণতন্ত্রের মূলস্রোত নিয়ন্ত্রিত হয়। আর তথ্যের অধিকারের মধ্য দিয়ে সেই নির্জন স্রোতোধারা বেগবতী হয়ে ওঠে। নির্বাধ তথ্যের অধিকার কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোটি পোক্ত রাখতে সাহায্য করে। ১৯৭২-৭৪ সালে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষে প্রায় এক লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে অনাহারে। নোবেল বিজয়ী বাঙালি অধ্যাপক অমর্ত্য সেন গবেষণা করে

দেখিয়েছেন, ওই বছরগুলোয় ইথিওপিয়ার খাদ্যশস্যের উৎপাদন অন্য বছরের তুলনায় সামগ্রিকভাবে বেশি হয়েছিল। ইথিওপিয়ার 'ওলো' অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ভয়ংকর আকার ধারণ করে। এ কথা ঠিক, ওলো অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রীর অভাব ছিল। কিন্তু সেখানে অভাব থাকতে পারে, এর জন্য সেখানে লোক না খেয়ে মরবে কেন? অনায়াসে উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে খাবার সেখানে সরবরাহ করা যেত। ঢাকা শহরে ধান উৎপাদন হয় না বলে কি সেখানের লোক না খেয়ে মরে? এ কথা ঠিক, খরা হলে কেবল শস্যের উৎপাদন কমে তাই নয়, খাদ্যের ওপর দরিদ্র মানুষের ও শ্রমজীবী মানুষের স্বত্বাধিকার কমে। কিন্তু ওলো অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের তথ্যটাই প্রথমদিকে ইথিওপিয়ার অন্যত্র পৌঁছায়নি। বিশ্বের অন্যত্র তো নয়ই। যখন কঙ্কালসার হাজার হাজার মানুষ হাইওয়ের ওপর উঠে এসে গাড়ি থামিয়ে শহরগামী মানুষের কাছে খাবার চেয়েছে, তখন সেই বাসযাত্রীদের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের খবর ছড়িয়ে পড়ে। আরও আশ্চর্যের এবং হৃদয়বিদারক বাস্তব সত্য এই–দুর্ভিক্ষের সময়গুলোয় খাবার পাঠানো তো দূরের কথা, সেখান থেকে খাদ্যসামগ্রী আদ্দিস আবাবা এবং আসমেরাতে চালান হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য কারণের সঙ্গে এখানেও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার জন্য মূলত তথ্য সরবরাহের ব্যর্থতা অনেকখানি দায়ী।

১৯৪৩ সালে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে ২০ থেকে ৩০ লাখ মানুষ মন্বন্তরে বাংলায় প্রাণ হারায়। ওই বছর বাংলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন এমন কিছু কম হয়নি। তথাপি বাংলায় সর্বত্র দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। উচ্চবিত্তের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। ব্রিটিশ সরকার খুব সযত্নে এই দুর্ভিক্ষের খবর ভারতের সর্বত্র এবং বিশেষ করে ব্রিটেনে পৌঁছাতে দেয়নি। সরকারি তথ্যে কেবল কোনো একটি অঞ্চলে সাময়িক একটু সমস্যা হয়েছে–এ ধরনের মন্তব্য করে তথ্য বিকৃত করা হয়। কিন্তু যখন কলকাতার রাস্তায় দুর্ভিক্ষপীড়িত হাজারে হাজার মানুষের মৃতদেহ পচতে শুরু করল, তখন 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সম্পাদক জুয়ান স্টিফেনস ১৯৪৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ও ১৬ অক্টোবর দুটি সম্পাদকীয়তে সব তথ্য প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সংসদে যখন এ তথ্য পৌঁছায়, তখন পুরো ব্রিটেনবাসী লজ্জায় মুখ লুকাতে বাধ্য হয়েছিল। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের তথ্য সম্প্রচারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিতে পেরেছিল।

১৯৮০ সালে জিম্বাবুয়ে এবং বতসোয়নার মতো দরিদ্র গণতান্ত্রিক দেশে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখেও দুর্ভিক্ষকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এবং আজও গণতান্ত্রিক দেশে দুর্ভিক্ষ যে হয় না, এর প্রধান কারণ গণতন্ত্রে মোটামুটিভাবে তথ্যের অধিকার স্বীকৃত। তাই অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'গণতন্ত্রে দুর্ভিক্ষ হয় না, হবে না।' গণতন্ত্রের বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও তথ্যের দ্রুত সম্প্রচার সেখানে বাধা সৃষ্টি করা যায় না বলে সরকারকে টিকে থাকার স্বার্থে জরুরিকালীন অবস্থার ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

বাইশশত বছর আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট অশোক তাঁর প্রজাদের তথ্যের অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছিলেন। তিনি প্রজাদের তথ্য সরবরাহ করতেন নির্ভুলভাবে। যাতে তা অবিকৃতভাবে পেতে পারে, সেজন্য নজর রাখতেন। প্রজাদের কী কী করণীয় বা তাদের কাছে কী কী প্রার্থিত, সে সম্পর্কে সম্রাট অশোক তাঁর শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনই তিনি প্রজাদের কী কী অধিকার, এরও নির্দেশ দিয়েছেন। তথ্য যাতে প্রজাদের বোধগম্য হয়, তাঁরা যাতে তাঁদের অধিকার কার্যকর করতে পারে এবং মহামাত্যরা যাতে তথ্য বিকৃত করতে না পারে, সেজন্য ভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য আলাদা শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি স্থাপন করেছিলেন।

পেছন ফিরে যদি দেখি, ১৭৮৯ সালের ২৬ আগস্ট মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণায় সরাসরি তথ্যের অধিকার বলে কিছু ছিল না। আজ আমরা তথ্যের অধিকার বলতে যে ধরনের বিষয় বুঝি, সেকালের প্রেক্ষাপটে ছিল তা অস্বাভাবিক। রাজপ্রাসাদে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতায় সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগই ছিল না। ফরাসি বিপ্লবের সময় পাওয়া নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকারের ঘোষণা জনগণের কথা বলার অধিকার গড়ে তোলার পথ সুগম করে। নিজের কথা নিজেরই মতো ভাবতে পারা, এমনকি প্রয়োজনে তা প্রকাশও করতে পারা এবং সে প্রকাশের পথে জনজীবনে বিঘ্ন না ঘটলে আর কোনো অন্তরায় নেই। এ অধিকারের স্বীকৃতি এ কালের তথ্যের অধিকার পৌঁছানোর পথে এক বড়ো ধাপ। সাধারণ নাগরিকের নাগরিকত্ব তার মানবত্ব এবং তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি আছে এর মধ্যে। এ অধিকারের কারণে তাঁকে তাঁর স্বীকৃতির জন্য রাজ অভিপ্রায়ের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে না।

ফরাসি ঘোষণার ১৭টি ধারার মধ্যে ১১নং ধারায় বলা হয়েছে: 'চিন্তা ও মতামতের অবাধ প্রবাহ মানুষের এক মহার্ঘ্য অধিকার। অতএব, প্রত্যেক নাগরিকের বলা, লেখা ও ছাপানোর অবাধ স্বাধীনতা আছে, তবে (প্রচলিত) আইন অনুসারে এ স্বাধীনতার অপব্যবহারের দায়িত্ব সেই নাগরিককেই বহন করতে হবে।'

মতপ্রকাশের এই ধারাটিকে তথ্যের অধিকার ধারণার অঙ্কুরোদ্গম বলে মনে করা হয়। তথ্যের অধিকার বলতে একালে মূলত যে ধরনের অধিকার বিষয়ে আলোচনা হয়, জাতিসংঘের সনদের সরাসরি সে পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, বলা যাবে না। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১২নং ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তায় পারিবারিক ব্যাপারে বাড়িয়ে কিংবা চিঠিপত্রে কেউ যথেচ্ছভাবে নাক গলাতে পারবে না, কিংবা তার সম্মান ও সুনামে আঘাত হানতে পারবে না। এই ধরনের নাক গলানো কিংবা আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই আইনি সুরক্ষার অধিকার আছে।'

এই ধারা প্রসঙ্গে লক্ষ করার আছে যে, তথ্যের অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনায় এমন একটা ধারণা কাজ করে যে, 'জনকর্তৃপক্ষ' নানা কারণে নাগরিকের কাছ থেকে তথ্য গোপন করেন। হয়তো অনেক সময়ে প্রশাসনের সুবিধার জন্যই এটা করা হয়। তথ্যের অধিকার বলতে অনেক সময় এই জাতীয় অধিকারকেই বোঝানো হয়ে থাকে। আড়াল করা তথ্য পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠা। ১২নং ধারা কিন্তু বলছে, ব্যক্তি হিসাবে কিছু তথ্য আড়ালে রাখার অধিকার নাগরিকের রয়েছে, এ কথাটার স্বীকৃতি আছে এই ধারায়।

তাহলে দেখার বিষয় যে, এ দুই বিষয়ের মধ্যে বিরোধ না থাকলেও যে তথ্য আড়াল রাখতে চাওয়া হয়, তা জনস্বার্থ রক্ষার প্রতিকূল কি না। সর্বজনীন অভিপ্রায় এখানে সামনে আসে। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের এই যুগে ১২নং ধারার বিষয়টি অবশ্যই ধারণ করা সংগত। অভিযোগ আছে যে, আমাদের মধ্যে তথ্যকে আটকে রাখার, কবজায় রাখার, কুক্ষিগত করে রাখার একটি প্রবণতা রয়েছে। এবং এটা অনেকটাই সামাজিকভাবে স্বীকৃত। অর্জিত তথ্য ভাগ করে নেওয়ার প্রবণতা আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না। সবার সবকিছু জানতে নেই–এমন একটা চল ছিল সর্বত্র। আজ তথ্য অধিকার আইন চালু হওয়ার পর সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষের সচেতনতা বাড়ছে তথ্য পাওয়ার অধিকার বিষয়ে। জনগণ তার প্রাপ্য তথ্য বুঝে পাবে, আইন সেই পথেই নিয়ে যাবে।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রী

দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন সংবাদ প্রচার করবেন না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়–এমন কোনো সংবাদ প্রচার না করতে সাংবাদিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গণমাধ্যম অবশ্যই সরকারের সমালোচনা করবে, স্বাধীনতা ভোগ করবে, তবে তা যথাযথ দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে করা উচিত। ১০ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয়ে অসুস্থ, অসচ্ছল ও আহত ৪৩৮ সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে ৩ কোটি ৪১ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণকালে এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, এমন কোনো সংবাদ প্রকাশ করবেন না, যা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন এবং চলমান অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করে। তিনি সব সময় গণমাধ্যমে গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানান। কারণ, এতে তারা নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারেন। গঠনমূলক সংবাদ সরকার চালাতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, দেশের অগ্রযাত্রা (দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার কারণে) আর যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার সবার আছে। তবে এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং কর্তব্যপরায়ণতা দেখাতে হবে। তিনি বলেন, সরকার বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

আওয়ামী লীগ সরকারের ১৪ বছরে সাংবাদিক সমাজ যে ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করেছে, এর আগে তা কখনোই করেনি। গণমাধ্যমকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তা দেশকে ডিজিটালে রূপান্তরে আরও সহায়ক হবে। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর একটি মাত্র টেলিভিশন চ্যানেল ছিল বিটিভি, অথচ তাঁর সরকার মূলত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বেসরকারি খাতে অনেক টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রকে লাইসেন্স দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার বেসরকারি চ্যানেলগুলোকে ওয়েজ বোর্ডের আওতায় আনতে যাচ্ছে। তিনি সংবাদমাধ্যমের মালিকদের বাংলাদেশ জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে অর্থ সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানান। সরকারপ্রধান বলেন, সাংবাদিকরা নিজেদের জন্য বাড়ি করতে চাইলে সরকার জমির ব্যবস্থা করতে পারে অথবা কিস্তিতে সরকারি ফ্ল্যাট দিতে পারে।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্যসচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকারও বক্তব্য দেন। বিএফইউজে, ডিইউজেসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকা দিয়ে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (বিজেডব্লিউটি) তহবিল শুরু করেন। পরে এ তহবিলে তিনি আরও ২০ কোটি টাকা দেন। এ ফান্ড থেকে এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৫১০ সাংবাদিকের মধ্যে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। (সূত্র: ১১ জুলাই ২০২৩, সমকাল)

ক্র্যাবের ৪০ বছর পূর্তিতে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

রাজনৈতিক অপরাধ থেকে সমাজ রক্ষায় কাজ করুন

রাজনৈতিক অপরাধ ও বিত্তবৈভব প্রদর্শনীর কলুষ থেকে সমাজ রক্ষায় কাজ করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ।

২৪ জুলাই দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্র্যাব) ৪০ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশে এখন তাড়াতাড়ি বড়োলোক হওয়ার প্রবণতা। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এ প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এ প্রতিযোগিতায় নানাভাবে অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, অন্যায্যভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়াচ্ছে, মুনাফা লুটছে, যা পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষিত করছে, রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।' তিনি আরও বলেন, 'এটি যেন না হয়, সেজন্য এর বিরুদ্ধে আপনারা সাংবাদিকরা লিখবেন।' তাহলে ক্রাইম রিপোর্টারদের ভূমিকা আরও শানিত হবে এবং দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। (সূত্র: ২৫ জুলাই ২০২৩, কালের কণ্ঠ)

কলকাতা প্রেস ক্লাবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি যেমন মাথাচাড়া দেবে, জঙ্গিবাদও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ২৭ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'সাংবাদিকদের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে ভারতীয় সাংবাদিকদের উন্মুক্ত প্রশ্নের জবাব দেন ভারত সফররত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি। বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না এলে এখানে সাম্প্রদায়িকতা ফণা তুলবে কি না–এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন একসঙ্গে বাংলাদেশে ৬৩ জেলায় বোমা হামলা হয়েছিল। শায়খ আবদুর রহমান, বাংলাভাই, আফগানিস্তানের ট্রেনিংপ্রাপ্তরা প্রকাশ্যে মহড়া দিত। এই হচ্ছে বিএনপি সরকারের আমল।' তিনি বলেন, "যখন আমরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তখন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া প্রকাশ্যে বলেছেন, 'কিছু লোককে ধরে এনে আটকে রাখা হয়, চুল-দাড়ি লম্বা হলে তাদের জঙ্গি আখ্যা দেওয়া হয়।' বাংলাদেশে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকে, তাহলে সেই সাম্প্রদায়িকতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে।" (সূত্র: ২৮ জুলাই ২০২৩, কালের কণ্ঠ)

সততা ও স্পষ্টবাদিতায় প্রজন্মের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন কার্টুনিস্ট এমএ কুদ্দুস

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের স্মরণসভা

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সিনিয়র সহসভাপতি, প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট এমএ কুদ্দুস সততা ও স্পষ্টবাদিতায় এ প্রজন্মের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন। ২৬ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সালাম হলে ডিইউজে আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক বলেন, কুদ্দুস ছিলেন একজন মেধাবী মানুষ। নীতি-আদর্শের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন তিনি। তাঁর মতো মানুষ আমাদের ইউনিয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল। বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, মৃত্যুর কয়েকদিন পরই আমরা সবকিছু ভুলে যাই। তাই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, কুদ্দুসের মতো স্বল্পভাষী, বিনয়ী, সৎ এবং দৃঢ় চরিত্রের গুণাবলি খুব কম মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। সত্যকে সত্য বলা, কালোকে কালো এবং সাদাকে সাদা বলার সৎসাহস তাঁর ছিল। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন একটু আলাদা। যা বিশ্বাস করতেন, তাই করে দেখাতেন।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও যুগ্মসম্পাদক খায়রুল আলমের সঞ্চালনায় স্মরণসভায় আরও বক্তব্য দেন বিএফইউজের সাবেক মহাসচিব আবদুল জলিল ভুঁইয়া, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কাজী রফিক ও কুদ্দুস আফ্রাদ, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ বাদল, সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক

২৬ জুলাই ডিইউজের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে কার্টুনিস্ট এম এ কুদ্দুসের স্মরণসভায় প্রেস ক্লাব সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বক্তব্য দিচ্ছেন

আকতার হোসেন, ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি আল-মামুন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মুরসালিন নোমানী, বিএফইউজের কোষাধ্যক্ষ খায়রুজ্জামান কামাল, ডিইউজের সহসভাপতি মানিক লাল ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ জিহাদুর রহমান জিহাদ প্রমুখ। (সূত্র: ২৭ জুলাই ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

সাংবাদিকদের সঙ্গে ইইউ প্রতিনিধিদলের বৈঠক

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে আলোচনা

সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের (ইইউ ইওএম) ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল ১৭ জুলাই কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছে। বৈঠকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) নিয়ে আলোচনা হয়।

ইইউ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন ডেইলি অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক ইনাম আহমেদ, নিউ এজের সম্পাদক নুরুল কবীর এবং প্রথম আলোর ইংরেজি ওয়েবের প্রধান আয়েশা কবির। বৈঠক শেষে ইকবাল সোবহান চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'ইইউ প্রতিনিধিরা প্রথমে ডিএসএ সম্পর্কে আলাদাভাবে জানতে চাননি। তারা বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমরা আমাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারছি কি না, তা জানতে চেয়েছিলেন।' তিনি বলেন, 'ডিএসএ প্রসঙ্গে সরকারের কাছে পাঠানো সুপারিশগুলো আমরা তাদের বলেছি এবং নিজেদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা ডিএসএ প্রসঙ্গে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ, তা জানিয়েছি। আমরা সেখানে আমাদের সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন দেখতে চাই।' তিনি বলেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখবে বলেও আমরা জানিয়েছি।' (সূত্র: ১৮ জুলাই ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

কামরুল ইসলাম চৌধুরী স্মরণসভা

বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের (এফইজেবি) চেয়ারম্যান ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরী স্মরণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্মরণসভার আয়োজন করে এফইজেবির নির্বাহী কমিটি। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বদিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এফইজেবির সাধারণ সম্পাদক হাসান হাফিজ, যুগান্তর সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম প্রমুখ। বক্তারা দেশের পরিবেশ সাংবাদিকতায় কামরুল ইসলাম চৌধুরীর বলিষ্ঠ ও বহুমাত্রিক অবদানের কথা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে এফইজেবিকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন। কামরুল ইসলাম চৌধুরী ২ মে ইন্তেকাল করেন। (সূত্র: ১ আগস্ট ২০২৩, প্রথম আলো)

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে জাতীয় প্রেস ক্লাব নেতাদের শ্রদ্ধা

শোকাবহ আগস্টের চতুর্থ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের নেতারা। ৪ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও সাবেক সভাপতি সাইফুল আলমসহ সদস্যরা। এ সময় তাঁরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মহান নেতার প্রতি সম্মান দেখান। এরপর পবিত্র ফাতেহাপাঠ করে তাঁরা বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া-মোনাজাত করেন। নেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্যও প্রার্থনা করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সহসভাপতি রেজোয়ানুল হক রাজা, যুগ্মসম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া, আশরাফ আলী, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কাজী রওনাক হোসেন, শাহনাজ সিদ্দিকী সোমা, কল্যাণ সাহা ও জুলহাস আলম। (সূত্র: ৫ আগস্ট ২০২৩, সমকাল)

ঢাবি সাংবাদিক সমিতি

বর্ষসেরা প্রতিবেদক পুরস্কার পেলেন ছয় সাংবাদিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) বর্ষসেরা প্রতিবেদক পুরস্কার পেয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ছয়জন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি। এছাড়া মাসিক প্রতিবেদক পুরস্কার পেয়েছেন সাতজন।

১০ আগস্ট ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে ডুজার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও দায়িত্ব হস্তান্তর, বর্ষসেরা প্রতিবেদক পুরস্কার প্রদান

এবং বার্ষিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার তুলে দেন। ডুজার বিদায়ি কমিটির সভাপতি মামুন তুষার সভাপতিত্ব করেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন প্রথম আলোর আসিফ হাওলাদার, দ্য ডেইলি অবজারভারের তাওসিফুল ইসলাম, বিডিনিউজ২৪ডটকমের রাসেল সরকার, দ্য নিউ নেশনের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান, কালবেলার মোতাহার হোসেন এবং ঢাকা পোস্টের প্রতিনিধি আমজাদ হোসেন হৃদয়। (সূত্র: ১১ আগস্ট ২০২৩, সমকাল)

পরিবার পরিকল্পনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১০ সাংবাদিক

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১০ গণমাধ্যমকর্মী। ২ আগস্ট রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টারের মধুমতী হলে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এদিন আলোচনাসভা ও মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

তিন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক হলেন সমকালের স্টাফ রিপোর্টার সাজিদা ইসলাম পারুল, কালবেলার সিনিয়র রিপোর্টার রীতা ভৌমিক, স্টাফ রিপোর্টার মাহমুদুল হাসান, দৈনিক সাতমাথা বগুড়ার বার্তা সম্পাদক এফ শাহজাহান, বাসসের সিনিয়র রিপোর্টার বরুণ কুমার দাশ, দ্য ওশান টাইমসের নিজস্ব প্রতিবেদক কেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী, এটিএন বাংলার বিশেষ প্রতিনিধি শারফুল আলম, ডিবিসির সিনিয়র রিপোর্টার তাহসিনা জেসি, বিটিভির মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ফারহানা মির্জা এবং বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা সংবাদদাতা আসিফ ইকবাল।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সচিব আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব ড. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। (সূত্র: ৩ আগস্ট ২০২৩, সমকাল)

'সুপার-সমকাল আর্থকোয়েক অ্যান্ড ফায়ার প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩' অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে অতিথিরা

সুপার-সমকাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন তিন সাংবাদিক ও তিন প্রতিষ্ঠান

দেশে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং এ বিষয়ে প্রস্তুতিতে ভূমিকা রাখায় তিন প্রতিষ্ঠান এবং তিনজন সাংবাদিককে 'সুপার-সমকাল আর্থকোয়েক অ্যান্ড ফায়ার প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩' দেওয়া হয়েছে। ২৩ আগস্ট রাজধানীর গুলশানের এক হোটেলে বিজয়ী প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকের হাতে ক্রেস্ট এবং পুরস্কারের অর্থ তুলে দেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান। সমকাল ও সুপার কনসোর্টিয়াম যৌথভাবে দ্বিতীয়বারের মতো এই পুরস্কার প্রদান করে।

এবার 'প্রাইভেট সেক্টর' ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে যথাক্রমে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এবং এসিআই লজিস্টিক লিমিটেড (স্বপ্ন)। 'ম্যাস মিডিয়া জার্নালিজম' ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদ রানা। প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন যথাক্রমে সময় টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার মার্জিয়া হাশমি মম ও নিউ এজের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদ আহমাদ।

উভয় ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেরার জন্য পুরস্কার ছিল যথাক্রমে ৩৫ হাজার ও ২৫ হাজার টাকা করে। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী।

ইউনাইটেড পারপাসের কান্ট্রি ডিরেক্টর রামাপ্পা গঞ্জিকারার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন প্রমুখ। (সূত্র: ২৪ আগস্ট ২০২৩, সমকাল)

'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' পেলেন ঢাবির ১০ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২১ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করায় ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' লাভ করেছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী হলেন মো. নাসিমুল হুদা, এসএম শামস্ রহমান, সুমাইয়া সানজানা নিম্মি, নওশীন বীথি, অর্থী নবনীতা, মারিয়া আনিস চৌধুরী, মো. মাহফুজুল ইসলাম, নীতি চাকমা, সুজন সেনগুপ্ত ও সৈয়দ মোহাম্মদ রাহাতুল ইসলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে এ পুরস্কার

তুলে দেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি মো. শফিকুল করিম বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীনের সহপাঠী নাছিমা হায়দার এবং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইফুল আলম চৌধুরী। বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সহযোগী অধ্যাপক শাওন্তী হায়দার অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ, আদর্শবান, সজ্জন ও নীতিমান শিক্ষক ও গবেষক। বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এ জাতীয় বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবে। অধ্যাপক সিতারা পারভীনের মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান। (সূত্র: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, কালের কণ্ঠ)

ইমক্যাবের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ সম্পাদক মাছুম

বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ-ইমক্যাবের নির্বাচনে কুদ্দুস আফ্রাদ (আনন্দবাজার পত্রিকা) সভাপতি এবং মাছুম বিল্লাহ (দৈনিক যুগশঙ্খ, ইস্টার্ন ক্রনিকল) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

১২ আগস্ট রাজধানীর বাগিচা রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ইমক্যাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আগামী দুই বছরের জন্য পূর্ণাঙ্গ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি রাজীব খান, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মীর আফরোজ জামান (ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া-ইউএনআই), কোষাধ্যক্ষ আবু আলী (আমার অসম) এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল হক ভূঁইয়া (ভ্যানগার্ড)। কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন রফিকুল ইসলাম সবুজ (দেশের কথা), শাহীদুল হাসান খোকন (ইন্ডিয়া টুডে), সিয়াম সারোয়ার জামিল (আজকের কাগজ ও ইম্ফল টাইমস), নির্মল চক্রবর্তী (ফেইস নিউজ) ও জাকির হোসেন (স্যন্দন পত্রিকা)।

ইমক্যাব নির্বাচনের (২০২৩-২০২৪) ভোটগ্রহণের নির্ধারিত দিন ছিল ১২ আগস্ট। ৭ আগস্ট ছিল মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার শেষ সময়। তবে সব পদেই একটি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ায় সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সংগঠনের বিদায়ি সভাপতি বাসুদেব ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন উত্থাপন করেন বিদায়ি সাধারণ সম্পাদক মাছুম বিল্লাহ। কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট উত্থাপন করেন বিদায়ি কোষাধ্যক্ষ আমিনুল হক ভূঁইয়া। (সূত্র: ১৩ আগস্ট ২০২৩, সমকাল)

জ্যাকসন ওয়াইল্ড ফেস্টিভ্যাল ২০২৩

আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল প্রামাণ্যচিত্র 'গনি'

দৈনিক ইত্তেফাকের আলোকচিত্রী আবদুল গনির জীবন নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র চলতি বছরের জ্যাকসন ওয়াইল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করেছে। প্রামাণ্যচিত্রটি 'গ্লোবাল ভয়েসেস' ক্যাটাগরিতে জয় পেয়েছে। এটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন শহিদুল আলম ও মালাইকাভাস। দৃক পিকচার লাইব্রেরি ও আনটেমড প্ল্যানেট প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছে। ২৯ সেপ্টেম্বর দৃক পিকচার লাইব্রেরির পক্ষ থেকে এই পুরস্কারপ্রাপ্তির তথ্য জানানো হয়। দৃক পিকচার লাইব্রেরি তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মানবাধিকারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও সমুন্নত করবে এবং ফিল্মের কাহিনির চমৎকারিত্বের প্রতি আরও মনোযোগী করবে।

প্রামাণ্যচিত্রটি আবদুল গনির জীবনযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধজয়ের কাহিনি তুলে ধরে। সে জীবন সংগ্রামের, বেদনার। আবার সেই বেদনাকে শক্তিতে পরিণত করে আলোকিত জীবনের দিকে ধাবিত হওয়ার কাহিনি হচ্ছে 'গনি'। প্রামাণ্যচিত্রটি একজন অভিবাসী কর্মী থেকে একজন ফটোসাংবাদিক হয়ে ওঠার গল্প বলে। যার কেন্দ্রে 'গনি'। পাশাপাশি একজন ফটোসাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে কাতারে অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা ও করুণ পরিস্থিতিকে তুলে ধরে। এছাড়া এতে উঠে এসেছে গনির বর্তমানের কাজের পরিবেশ এবং পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কের গল্পও। প্রামাণ্যচিত্রে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের যে কঠোর-কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়, তার জীবন্ত চিত্র উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে নিয়োগকারীদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ এবং গ্রীষ্মকালে কাতারের নির্দয় সূর্যালোকে দগ্ধ হয়ে কত যুবক মারা গেছে, সেই তথ্যকেও সামনে নিয়ে আসে।

এবারের প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭৪টি দেশ থেকে ১১শ ক্যাটাগরিতে ছবি জমা

জ্যাকসন ওয়াইল্ড ফেস্টিভ্যাল ২০২৩

পড়েছিল। ১২শ ঘণ্টা স্ক্রিনিংয়ের পর দুই শতাধিক বিচারকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ফলাফল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া অভিবাসী শ্রমিকদের সেদেশের নির্মাণশিল্পে কাজ করার সময় যে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়, তার জীবন্ত চিত্র উঠে এসেছে দৃকের পুরস্কারজয়ী 'গনি' প্রামাণ্যচিত্রে। দৃকের উদ্যোগে ২০২১ সালে কাতারে ছবিটির কাজ শুরু হয়। ২০২২ সালের জুলাইয়ে আনটেমড এই উদ্যোগে যোগ দেয় এবং বাংলাদেশ ও কাতারে আরও শুটিং করা হয়। এর আগে আলোকচিত্রী আবদুল গনি দৃক আয়োজিত বাংলাদেশ প্রেস ফটো কনটেস্ট ২০২৩-এর বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে নেন। (সূত্র: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

শোক সংবাদ

কাজী শাহেদ আহমেদ

অধুনালুপ্ত দৈনিক আজকের কাগজ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক, জেমকন গ্রুপের চেয়ারম্যান লে. কর্নেল (অব.) কাজী শাহেদ আহমেদ (৮২) রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৮ আগস্ট ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা, ক্রীড়া সংগঠক কাজী শাহেদ আহমেদ ১৯৪০ সালের ৭ নভেম্বর যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশের পর তিনি ১৪ বছর সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রতিষ্ঠাকালীন প্লাটুন কমান্ডারদের একজন। দেশে পত্রিকায় যে আধুনিকতার উপস্থিতি, তা শুরু হয়েছিল কাজী শাহেদের সম্পাদনায় প্রকাশিত আজকের কাগজের হাত ধরে। পত্রিকাটি তৎকালীন মুক্তমত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৭৯ সালে 'জেমকন গ্রুপ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কাজী শাহেদের ব্যবসায়-জীবন শুরু। বাংলাদেশে প্রথম অর্গানিক চা-বাগানের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। এই ক্রীড়া সংগঠক দীর্ঘদিন আবাহনী ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য পরিমণ্ডলেও কাজী শাহেদ সুপরিচিত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আমার লেখা'। এটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। ওই বছরই প্রকাশিত হয় 'ঘরে আগুন লেগেছে' গ্রন্থটি। ২০১৩ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ভৈরব' প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনী 'জীবনের শিলালিপি' প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। একই বছর প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'পাশা'। ২০১৭ সালে 'দাঁতে কাটা পেনসিল' এবং ২০১৮ সালে 'অপেক্ষা' উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। ২৯ আগস্ট তৃতীয় জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

এম শাহজাহান মিয়া

বর্ষীয়ান সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান বার্তা সম্পাদক এম শাহজাহান মিয়া (৮২) ২৬ জুলাই রামপুরার নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

শাহজাহান মিয়া অবিভক্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক মহাসচিব ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

শাহজাহান মিয়া ১৯৪৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জ (বিক্রমপুর) জেলার লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া ইউনিয়নের কাজিরগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৬৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স এবং ১৯৬৭ সালে মাস্টার্স করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা এবং ১৯৭৫ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭০ সালে অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল' পত্রিকায় পেশাগত জীবন শুরু করেন। ২৭ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ লৌহজংয়ের স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বুলবুল মহলানবীশ

না ফেরার দেশে চলে গেলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক বুলবুল মহলানবীশ (৭০। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৪ জুলাই রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

বুলবুল মহলানবীশ একাধারে কবি ও লেখক, সংগীত, নাট্য ও আবৃত্তিশিল্পী হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি টেলিভিশন-বেতার-মঞ্চে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করতেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকালে সেই সময়কার রেসকোর্স ময়দানে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করছিল, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কলকাতার বালিগঞ্জের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ' গানটি। বাঙালির বিজয়ের ঐতিহাসিক ক্ষণে কালজয়ী গানটিতে কণ্ঠ দেওয়া শিল্পীদের অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল মহলানবীশ।

নজরুল সংগীতশিল্পী বুলবুল মহলানবীশের জন্ম ১৯৫৩ সালের ১০ মার্চ। তিনি নজরুল সংগীতশিল্পী পরিষদের সহসভাপতি এবং রবীন্দ্র একাডেমির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তার দুটি গানের অ্যালবাম রয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ১২টির বেশি গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি ও স্মৃতি ৭১ তাঁর বহুল আলোচিত বই। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য পেয়েছেন চয়ন স্বর্ণপদক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ফাউন্ডেশন সম্মাননা ও পশ্চিমবঙ্গের নজরুল একাডেমি সম্মাননা পদক।

শহিদুল ইসলাম

সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম (৮২) ২৮ আগস্ট বার্ধক্যজনিত কারণে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ওইদিন জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর দুমকির শ্রী-রামপুরের (রাজাখালী) মিয়াবাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

শহিদুল ইসলাম ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় দৈনিক সংবাদে সাংবাদিকতা করতেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন তিনি। পরে সংবাদের সহ-সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পড়েছেন এবং জার্মানি থেকে সাংবাদিকতায় উচ্চতর ডিগ্রি নেন। তিনি পৃথিবীর বহু দেশে সাংবাদিকতা বিষয়ে ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এমএ কুদ্দুস

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সিনিয়র সহসভাপতি ও দৈনিক সংবাদের কার্টুনিস্ট এমএ কুদ্দুস (৫০) ১৫ জুলাই রাজধানীর শাহীনবাগের বাসভবনে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ রাজবাড়ীর গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। শিল্পীর সচেতনতা আর সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসার মেলবন্ধন দেখা গেছে কার্টুনিস্ট সাংবাদিক এমএ কুদ্দুসের কাজে। সমাজের অসংগতিকে সহজ-সাবলীলভাবে তুলে এনেছেন তাঁর কার্টুনের আঁচড়ে। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মানুষের পক্ষে তাই সব সময় তাঁর কার্টুন কথা বলেছে। সাংবাদিক নেতা হিসাবেও তিনি সত্যের প্রতি অনমনীয় ছিলেন। নীতির প্রশ্নে কখনোই করতেন না আপস। কিন্তু আচরণে ছিলেন সদাবিনয়ী।

এমএ কুদ্দুস ১৯৭৩ সালের ২০ আগস্ট রাজবাড়ী সদর উপজেলার মিজানপুর ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাপ্তাহিক একতা এবং দৈনিক ইত্তেফাকেও কার্টুনিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) স্থায়ী সদস্য ছিলেন।

এমএ কুদ্দুস ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে মৃৎশিল্প বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

এনায়েত রসুল

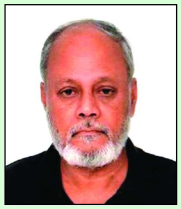

প্রবীণ সাংবাদিক এনায়েত রসুল (৭২) ৩১ জুলাই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১ আগস্ট জানাজা শেষে জুরাইন কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

কর্মজীবনে এনায়েত রসুল বাংলাদেশ টাইমস, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং নিউএজ-এ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি বাংলাদেশ এক্সপ্রেসের উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন।

আজাদ তালুকদার

একুশে পত্রিকার সম্পাদক, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য আজাদ তালুকদার (৪৫) রাজধানীর বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ আগস্ট ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার ক্যানসারে ভুগছিলেন। ওইদিন নগরীর জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রথম, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে দ্বিতীয় এবং গ্রামের বাড়ি রাঙ্গুনিয়ায় তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

শহীদ হাসান

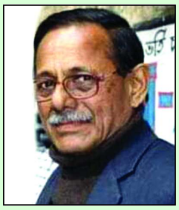

প্রবীণ সাংবাদিক শহীদ হাসান (৮৬) ১১ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

শহীদ হাসান দীর্ঘদিন দৈনিক জনতায় কর্মরত ছিলেন। হাসপাতাল থেকে দুপুরে তাঁর মরদেহ গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। পরে সেখানে বাদ মাগরিব জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

হাবিবুর রহমান খান

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন দৈনিক যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার হাবিবুর রহমান খান (৪১) (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২২ আগস্ট হঠাৎ বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন হাবিব। দ্রুত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মেধাবী ও বিচক্ষণ সাংবাদিক হাবিবুর রহমান খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি রাজনৈতিক বিট করতেন। যুগান্তরের সঙ্গে তার পথচলা ১৩ বছরের। মৃত্যুর দিনেও যুগান্তরের শেষ পাতায় তাঁর নামে লিড স্টোরি ছাপা হয়েছে। এই স্টোরি সকালে ফেসবুকে শেয়ারও করেন হাবিব। কে জানত এটাই তাঁর জীবনের শেষ প্রতিবেদন! মিরপুর শাইনপুকুর হাউজিং জামে মসজিদে জানাজা শেষে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য ছিলেন তিনি। হাবিবুর রহমানের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরের শিবচর। তাঁর বাবা মৃত মো. হাসেম খান আর মা জয়তুন্নেছা।

মেহেদী হাসান

বরগুনার আমতলী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মেহেদী হাসান (২৬) নামের এক সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও পাঁচ আরোহী আহত হন। ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় ওই সড়কের সেকান্দারখালী (বান্দ্রা) এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মেহেদী হাসান নিহত হন। তিনি দুমকি উপজেলার উত্তর পাঙ্গাশিয়া গ্রামের মো. শাহআলম মিয়ার ছেলে ও বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিক বরিশাল সংবাদ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার।

শেখ মঞ্জুর হোসেন মিলন

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ৪ আগস্ট বালুভর্তি ডাম্প ট্রাকের চাপায় গাজীপুরের সিনিয়র সাংবাদিক শেখ মঞ্জুর হোসেন মিলন (৫০) নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁদপুর ইউনিয়নের কোটবাজালিয়া চৌরাস্তার আবুল হোসেনের বাড়িসংলগ্ন স্থানে।

সাংবাদিক মিলন একটি মোটরসাইকেলে গাজীপুর থেকে কাপাসিয়া আসার পথে ওই স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ সময় ডাম্প ট্রাকটি তাকে টেনেহিঁচড়ে ১০ হাত দূরে নিয়ে যায়। জানা যায়, সড়কে সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ট্রাকটি মিলনের ওপর উঠিয়ে দিয়ে ড্রাইভার পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। কিন্তু ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাংবাদিক মিলন সাপ্তাহিক গাজীপুর দর্পণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং দৈনিক করতোয়া ও দৈনিক ভোরের দর্পণ পত্রিকার গাজীপুর প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়া তিনি যুগান্তর ও বৈশাখী টেলিভিশনের গাজীপুর প্রতিনিধি এবং দিনকাল পত্রিকার কাপাসিয়া প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সগীর হোসেন

দৈনিক সমকালের পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া প্রতিনিধি সগীর হোসেন (৪৮) ৬ সেপ্টেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

৬ সেপ্টেম্বর ভান্ডারিয়ার বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার সময় হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন সগীর। সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে বিকালে ভান্ডারিয়া বাসস্ট্যান্ডের কালেমা চত্বরে প্রথম এবং সন্ধ্যায় উপজেলার ধাওয়া ইউনিয়নের পশারিবুনিয়া গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

কাজী নুরুল ইসলাম

প্রথম আলোর ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি কাজী নুরুল ইসলাম (৬৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৫ সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সাংবাদিক কাজী নুরুল ইসলাম শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। ৪ সেপ্টেম্বর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিনাজপুর ইসলামিক কমিউনিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ৫ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। ৬ সেপ্টেম্বর পীরগঞ্জ পৌর শহরের সবুজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পীরডাঙ্গী কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়। এর আগে বেলা ২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর মরদেহ পীরগঞ্জ প্রেস ক্লাব চত্বরে রাখা হয়।

কাজী নুরুল ইসলাম সাংবাদিকতার পাশাপাশি পীরগঞ্জ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরে অবসরে যান। পীরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতিও ছিলেন তিনি।

জেন বারকিন

ষাট ও সত্তর দশকের অন্যতম স্টাইল আইকন ছিলেন তিনি। হয়ে উঠেছিলেন তরুণদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় এক নাম। ফরাসি গীতিকার সার্জ গেইনসবুর্গের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল সত্তরের দশকের অন্যতম চর্চিত বিষয়। সেই গায়িকা-অভিনেত্রী জেন বারকিন ১৬ জুলাই প্যারিসে মারা গেছেন।

১৯৪৬ সালে লন্ডনে জন্ম হয় জেন বারকিনের। পরে তিনি থিতু হন প্যারিসে। সেখানেই পান তারকাখ্যাতি। ১৯৬৮ সালে ২২ বছর বয়সে ফ্রান্সে পাড়ি জমান বারকিন। ১৮ বছরের বড়ো সার্জ গেইনসবুর্গের সঙ্গে পরিচয় সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে। এরপর প্রেম আর ১৩ বছরের ঘটনাবহুল সম্পর্কের শুরু। তাঁর সময়ের প্রথম সারির প্রায় সব ফরাসি পরিচালকের সঙ্গেই কাজ করেছেন বারকিন। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৭০টির বেশি। বারকিনের উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে আছে 'ব্লো আপ', 'ডেথ অন দ্য নাইল', 'ইভিল আন্ডার দ্য সান' ইত্যাদি।

বিমল কুমার যাদব

ভারতের বিহার রাজ্যে বিমল কুমার যাদব নামের এক সাংবাদিককে বাড়িতে গিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। তিনি ভারতীয় সংবাদপত্র দৈনিক জাগরণে কাজ করতেন। ১৮ আগস্ট ভোরে রাজ্যের আরারিয়া জেলায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বন্দুকধারীরা বিমলের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে এবং তাঁর নাম ধরে ডাকে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বুকে গুলি করা হয়। তবে হামলাকারীদের পরিচয় জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে পুরোনো শত্রুতার জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। দুই বছর আগে একইভাবে বিমলের ছোটো ভাই কুমার শশীভূষণকে হত্যা করা হয়। ওই হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বিমল। ওই ঘটনায় তাঁর সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য হুমকিও পেয়েছিলেন তিনি। ওই হুমকির সঙ্গে বিমলের হত্যার যোগসূত্র থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

নেলসন ম্যাটাস

মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলীয় গুয়েররোর রাজ্যের পর্যটন শহর আকাপুলকোর একটি স্টোর পার্কিং লটে গুলি করে নেলসন ম্যাটাস নামের এক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। দেশটিতে এক সপ্তাহে এটি সাংবাদিক হত্যার দ্বিতীয় ঘটনা। প্রসিকিউটররা বলেন, আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে নেলসন ম্যাটাসকে হত্যা করা হয়। তাঁরা এ হত্যার তদন্ত শুরু করেছেন। নিউজ আউটলেট লো রিয়াল ডি গুয়েররোর পরিচালক নেলসন ম্যাটার্স পার্কিং লটে গাড়িতে ওঠার সময়ে তাঁকে গুলি করা হয়। ম্যাটাস ১৫ বছর ধরে সাংবাদিকতা করে আসছিলেন। তিনি বিশেষ করে সহিংস ঘটনা নিয়ে কাজ করতেন। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের মেক্সিকো প্রতিনিধি বালবিনা ফ্লোরেস এ কথা জানান। দেশটিতে ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে।

পিআইবি'র প্রকাশনা

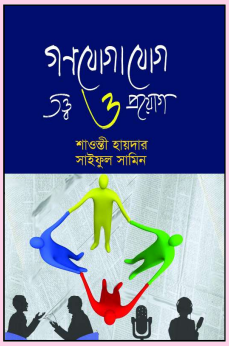

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

মার্কিন কর্মকর্তাদের আগমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বার্তা দেয়: তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক মন্তব্য করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, দুদেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা রয়েছে এবং বিশ্বাঙ্গনেও বহুমাত্রিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা কাজ করি। ৫ জুলাই সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রকাশিত গবেষক পপি দেবী থাপার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র বিরাট ভূমিকা রাখছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের আগমন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার বার্তাই বহন করে। এই আগমনকে আমরা স্বাগত জানাই।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রক্ষমতায় কারা যাবে, সেটি নির্ধারণ করার মালিক জনগণ। বিএনপির যদি কোনো নালিশ থাকে, তা দিতে হবে বাংলাদেশের জনগণের কাছে, বিদেশিদের কাছে নয়।

বিএনপির সরকার পতনের একদফা আন্দোলন চট্টগ্রাম থেকে শুরু হবে–এমন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হয়েছিলেন অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে। তারা তো মাঝেমধ্যেই একদফার আন্দোলনের ঘোষণা দেন। একদফার আন্দোলন চট্টগ্রামেই মারা যায় কি না, সেটিই দেখার বিষয়।

পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র সহযোগী সম্পাদক (প্রকাশনা) আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হক প্রমুখ।

টুঙ্গিপাড়ায় ৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

১৩ আগস্ট পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'My Gov Implementation service analysis' শীর্ষক কর্মশালায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বক্তব্য দিচ্ছেন

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পিআইবি মহাপরিচালকের শ্রদ্ধা

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

৫ আগস্ট সকালে পিআইবি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ১৫ আগস্টের শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তারা

ও মোনাজাত করা হয়। এ সময় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. ইলিয়াস হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ বাবুল হোসেন খোকনসহ স্থানীয় সাংবাদিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সমৃদ্ধ শব্দভান্ডারই সাবলীল প্রতিবেদনের অনুষঙ্গ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেছেন, সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার সাবলীল প্রতিবেদনের অন্যতম অনুষঙ্গ। শব্দের একবচন-বহুবচন, প্রমিত বানান ও অন্যান্য বিষয়ে ভালো জানাশোনা না থাকলে প্রতিবেদন তৈরি দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই প্রথমে ভাষা দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করার সক্ষমতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

৩১ আগস্ট প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা ও সহকারী তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য উন্নয়ন সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রমিত ভাষা ও বানানরীতিবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি।

জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকদের সঙ্গে তথ্য কর্মকর্তাদের সম্পর্ক থাকবে নিবিড়। একে অপরের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি।

পিআইবি'র মহাপরিচালক বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে স্মার্ট ধারণা থাকতে হবে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা/সহকারী তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য উন্নয়ন সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রমিত ভাষা ও বানানরীতিবিষয়ক প্রশিক্ষণ

নতুবা সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা কষ্টকর হয়ে যাবে। এমনকি ছিটকে পড়তে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ইয়াকুব উপস্থিত ছিলেন। পিআইবি'র সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ডি-নথি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পিআইবি'র ডি-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ১৭ আগস্ট পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপ্রধান হিসাবে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ডি-নথি নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় এটুআই-এর প্রতিনিধিরা ডি-নথির আইকন পরিচিতি, আগত ডাক, ডাক সিল তৈরি, ডাক প্রেরণ, প্রেরিত ডাক দেখা, ডাক নিষ্পত্তি করা, ডাক নথিজাত করা, ডাক আর্কাইভ করা, আর্কাইভ ও নথিজাত ডাক ফেরত আনার প্রক্রিয়া, নিবন্ধন বহি, প্রতিবেদন, খসড়া ডাক, নতুন নোট, স্মারকপত্র ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ এবং গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. কামরুল হক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রশিক্ষণে পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা/সহকারী তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য উন্নয়ন সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রমিত ভাষা ও বানানরীতিবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

সাংবাদিকদের সব বিষয়ে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার বলেছেন, সাংবাদিকদের সব বিষয়ে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সবই কিছু কিছু জানতে হবে। আবার কিছু বিষয়ে খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে। তাহলে সাবলীলভাবে সাংবাদিকতা করা সম্ভব।

৫ সেপ্টেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

তিনদিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিকদের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি, ফিচার লেখা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে ন্যূনতম একটি ধারণা তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শ্যামসুন্দর সিকদার। তিনি উচ্চতর বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি হওয়ার জন্য সাংবাদিকদের উদ্বুদ্ধ করেন।

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট পরিবর্তিত হয়ে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট হওয়ার প্রক্রিয়ার কথা জানিয়ে বিটিআরসির চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের সততা, নিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনই একমাত্র আইন, যা জনগণ সরকারের ওপর প্রয়োগ করতে পারে। তিনি সেবা সহজীকরণ ও সিটিজেন চার্টার নিয়ে আলোচনা করেন। কীভাবে তথ্য পেতে পারেন একজন সাংবাদিক, তথ্য না দিলে কী করতে পারেন একজন মিডিয়াকর্মী, এ সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি।

জাফর ওয়াজেদ আরও বলেন, ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদের অর্থাৎ মফস্সল সাংবাদিকদের কাজের পরিধি ঢাকার সাংবাদিকের চেয়ে বেশি। কারণ, ঢাকার সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট কোনো বিট কিংবা বিষয়ের ওপর অ্যাসাইনমেন্ট থাকে। কিন্তু মফস্সল সাংবাদিকরা খেলাধুলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অবক্ষয়, বৈষম্য–সব বিষয়ে কাজ করার সুযোগ পান।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের কারণে রাজধানী ঢাকা ও মফস্সলের মধ্যে প্রযুক্তির তারতম্য খুব বেশি নেই। এসব বিবেচনায় শহরের তুলনায় মফস্সল সাংবাদিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ এবং প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগের সহকারী সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

পিআইবি'র কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রের স্বার্থে সাংবাদিকদের দায়িত্ববান হওয়া বাঞ্ছনীয়
–তথ্য কমিশনার

সাংবাদিকতা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তাই সাংবাদিকদের জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের জনস্বার্থে কাজ করা বাঞ্ছনীয় বলে মন্তব্য করেন তথ্য কমিশনের কমিশনার শহীদুল হক ঝিনুক। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্ববান হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

২৬-২৮ আগস্ট ২০২৩, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ঠাকুরগাঁও জেলার সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবি'র পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদের সভাপতিত্বে ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন

শহীদুল হক ঝিনুক বলেন, সাংবাদিকদের প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে। যেন তাঁর প্রতিবেদনে বস্তুনিষ্ঠতা ফুটে ওঠে। অন্যথায় প্রতিবেদনটি পাঠকপ্রিয়তা হারাবে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে ও পরের কিছু বাস্তব চিত্রের বর্ণনা করে তথ্য কমিশনার ভারত ভাগ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য তুলে ধরেন। এমনকি বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) সীমানা ও সীমানাঘেঁষা অঞ্চল বণ্টন নিয়ে কথা বলেন। তিনি মোবাইল সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের সততার সঙ্গে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সমাজ বিনির্মাণে সৎ, সততার গুরুত্ব বুঝিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ সাংবাদিকদের প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সাংবাদিকদের মোবাইল সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। কীভাবে মোবাইল সাংবাদিকতা এগিয়ে নেওয়া যায়, ক্যামেরা সেটিং, অডিয়ো, ভিডিয়ো,

মাইক্রোফোন বা হেডফোন ব্যবহার, কনটেন্ট তৈরি করাসহ বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করেন।

এছাড়া প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ক্রস চেক, ফ্যাক্ট চেক বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ফ্যাক্ট চেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, ভুয়া তথ্য সমাজে বিশৃঙ্খলা, অনাচারসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবি'র সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন তথ্য কমিশনার শহীদুল হক ঝিনুক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনের অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য দেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এবং পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন

২১ সেপ্টেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে খুলনা জেলার কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, মফস্সলের পত্রিকাগুলোর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। কারণ, সেখানে বানান ভুল ও বাক্যগঠনে অগণিত ভুল পরিলক্ষিত হয়। এজন্য তিনি বাক্যশৈলী ও শুদ্ধ বানানের বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরের কিছু বাস্তব চিত্রের বর্ণনা করে শেখ ইউসুফ হারুন খুলনা জেলার কপিলমুনি ও বোয়ালিয়া অঞ্চলে স্বাধীনতাবিরোধীদের নৃশংসতা এবং পরবর্তী সময়ে জনতার আদালতে তাদের শাস্তির বিষয়টি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ সাংবাদিকদের প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেসব বিবেচনায় সমাজকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ এবং দৈনিক আজকের সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক এসএম আবু সাইদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবি'র সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৯ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ফেসবুকে ভুয়া তথ্য পরিবেশিত হয় সবচেয়ে বেশি

–শেখ ইউসুফ হারুন

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন বলেছেন, ফেসবুক ও সংবাদপত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফেসবুক অসম্পাদিত মাধ্যম হওয়ায় ভুয়া তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি। আর এ মাধ্যমে পাঠক বেশি হওয়ায় গুজব ছড়ানো সহজ হয়। এসব বিবেচনায় সংবাদপত্রের পাঠক বাড়াতে হবে।

খুলনা জেলার কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ৩১ আগস্ট প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত অনলাইন লাইভ সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ